প্রমীলা প্রসঙ্গ

অতুল সুর

প্রমীলা প্রসঙ্গ

ডঃ অতুল সুর

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলকাতা ৬

Pramila Prasanga
by Dr. Atul Sur

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৪৬। ডিসেম্বর ১৯৩৯

প্রকাশক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

মেনকা

(১৯১০—১৯২৬)

স্নুভগাস্নু

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

বিষয়সূচী

প্রমীলা কেন পুরুষ ভজে ? ৯
দেবলোকে প্রমীলা ৪৭
বিবাহের মঞ্চে প্রমীলা ৬১
বিপ্লবের সাথী প্রমীলা ৭২
প্রমীলা রহস্যময়ী ১০০

প্রমীলা কেন পুরুষ ভজে ?

মেয়েরা কেন পুরুষ ভজে ? মনে হবে এ প্রশ্নটা খুবই সোজা ও সরল। কিন্তু তা মোটেই নয়। প্রশ্নটা অত্যন্ত কুটিল ও জটিল। কেননা, এ প্রশ্নের অন্তরালে নিহিত আছে আরও অনেক আনুষঙ্গিক প্রশ্ন। যথা, পুরুষ-ভজনা করতে গিয়ে মেয়েরা কেন পুরুষের আধিপত্য মেনে নেয় ? আগেকার দিনের কথা ছেড়েই দিলাম। তখন তো মেয়েরা ছিল অবলা ও অসহায়া। অভিভাবক বা গুরুজনরা যা বলতেন, তারাও তাই করত। কিন্তু আজকের দিনে তো মেয়েরা শিক্ষিতা হয়েছে। অনেকে স্বাবলম্বীও হয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা কেন পুরুষের আধিপত্য মেনে নেয় ? অনেকে হয়ত বলবেন, এটা এক আদিম অভিশাপ। কেননা, মেয়েরা এক যৌনবুভুক্ষা নিয়েই ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূতা হয়েছিল। সেই আদিম যৌনক্ষুধার জন্যই মেয়েরা পুরুষের সঙ্গ চায়। আদিম যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই যদি মেয়েরা এরূপ করে, তাহলে প্রশ্ন জাগে মেয়েরা পুরুষের আধিপত্য না মেনে সেটা করতে পারে কিনা। আর আমরা যদি মনে করি মেয়েদের আদৌ কোনো সহজাত আদিম যৌনক্ষুধা নেই, তবে পুরুষের আধিপত্য মেনে নিয়ে তাদের দাম্পত্য-জীবন যাপনের প্রয়োজন হয় কেন ? হয়ত অনেকে বলবেন দাম্পত্য-জীবনে প্রবৃত্ত না হলে মেয়েরা জীবনে একটা নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতা অনুভব করে। সে কথা বললে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সেটা বৈধ উপায়ে, না অবৈধ উপায়ে করা উচিত ? জগতের প্রায় সব সমাজই চায় যে মেয়ে-পুরুষের যৌনজীবন বৈধ উপায়ে পালিত হওয়া উচিত। বৈধ উপায়ে যৌনজীবন পালন করা মানেই বিবাহে প্রবৃত্ত হওয়া। এ সম্পর্কেও প্রশ্ন অজস্র। বিবাহের পূর্বে অধিকাংশ মেয়েই তার জীবনসঙ্গী সম্বন্ধে নানারকম স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাস্তবজীবনে সে-

কল্পলোকের স্বপ্ন তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নাবলাসে পরিণত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পিতামাতা বা অভিভাবক কর্তৃক নির্বাচিত স্বামীর সঙ্গে সুখে ঘরকন্না করে কেন? আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিভাবকের সম্মতিক্রমেই হোক বা বিনা সম্মতিতে হোক মেয়েরা যে স্ব-নির্বাচিত পুরুষকে বরণ করে, সেক্ষেত্রেও তাদের দাম্পত্যজীবন অ-সুখকর হয়। অনেক স্থলে আবার দেখা যায় যে, সুন্দরী মেয়ে কুৎসিত পুরুষকেই ভজনা করে। কেন? যেমন ডেস্‌ডেমনা ওথেলোকে ভজনা করেছিল। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাতৃস্থানীয়া প্রৌঢ়া রমণী কেন প্রলুব্ধ হয় অল্পবয়স্ক তরুণকে বিবাহ করতে অথবা তার সঙ্গে দাম্পত্য-জীবন যাপন করতে? প্রথম বিদ্রোহী নারী জর্জ সাঁদ-এর (George Sand) জীবনে তো এটা বারংবার ঘটেছিল। প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাকের (Honor de Balzac) জীবনেও তাই। বালজাক তো দেখতে কুৎসিতই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও নয় ছেলের মা ৪৫ বছরের প্রৌঢ়া মাদাম বার্নি কেন ২৩ বছর বয়সের বালজাককে বিয়ে করেছিল? আবার সেই কুৎসিত ও দেনার দায়ে নিষ্পেষিত বালজাকের জীবনেই ঘটেছিল আর-এক বিচিত্র ঘটনা। চিকিৎসকদের কাছে বালজাকের মৃত্যু আসন্ন ও সুনিশ্চিত শুনেও তার মৃত্যুর মাত্র ছ'মাস পূর্বে ঐশ্বর্যশালিনী ইভেলিন তাকে কেন বিবাহ করেছিল? এরকম বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তারা তো পরস্পরের কাছে প্রেম নিবেদন করেছিল। উপন্যাসের জগতেও আমরা মেয়ে-পুরুষের অনুরূপ আচরণ দেখি। বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসে লক্ষ্মীর মত মার্জিতরুচিসম্পন্না মেয়ে স্বামী দাতারবাবুর উপস্থিতিতেই কেন সুধাংশুর মত চরিত্রহীনের অঙ্কশায়িনী হয়েছিল? আবার তারই সহোদরা সতী শ্বশুরবাড়ির অমানুষিক নির্যাতন সত্ত্বেও কেন স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়েছিল এবং ঘোষালসাহেবের মত লম্পটের কামলালসার গ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য চলন্ত ট্রেনের চাকার তলায় প্রাণ-

বিসর্জন দিয়েছিল ? আবার শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'-তে আমরা দেখি শশীর মত বেহালাবাদক শিল্পীকে ছেড়ে নবতারা কেন এক কারখানার মিস্ত্রিকে বিবাহ করেছিল ? এরকম অগণিত প্রশ্ন নিহিত আছে 'মেয়েরা কেন পুরুষ ভজে ?'—এই প্রশ্নের পিছনে। এসব প্রশ্নের উত্তর মেয়ে-দেরই দেওয়া উচিত, আমার মত ৮৪ বছর বয়সের পুরুষের নয়। কেননা, পুরুষ প্রমীলাকে কতটুকু চেনে ? মনে রাখতে হবে যে, যুগে যুগে নারী নির্যাতিত হয়েছে পুরুষের হাতে, অথচ নারী প্রেম ও সোহাগ দ্বারা পুরুষকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে নিজের সান্নিধ্যে। হয়ত অনেকসময় সামাজিক নিন্দার ভয়ে নারী এরূপ প্রেম ও সোহাগের অভিনয় করে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে তার মনের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হয় অন্যরূপ ভাবনা-চিন্তা। তাহলে সেক্ষেত্রে নারী তো পুরুষের কাছে ছলনাময়ী ও রহস্যময়ী হয়ে দাঁড়ায়। তাই বলছিলাম, প্রমীলা কেন পুরুষ-ভজনা করে, এ প্রশ্নের উত্তর প্রমীলারই দেওয়া উচিত, কোনো পুরুষের নয়। কেননা, পুরুষ তো শত চেষ্টা করলেও প্রমীলার অবচেতন মনের গভীরে পৌঁছোতে পারবে না। তবুও আমি পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, উপন্যাস ও বাস্তব জীবনের সাহায্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

নারী কেন পুরুষ-ভজনা করে, এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের প্রথমেই যেতে হবে সৃষ্টির সেই প্রথম দিনে, যেদিন সৃষ্ট নারী প্রথম পুরুষকে ভজনা করেছিল। এ সম্বন্ধে খ্রীস্টান পুরাণের সঙ্গে হিন্দু পুরাণের মতানৈক্য আছে। খ্রীস্টান পুরাণ অনুযায়ী ঈশ্বর পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করে তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন স্বর্গের উদ্যানে বিচরণ করতে। তবে তিনি চাননি তাদের মধ্যে যৌনতৃষ্ণার উন্মেষ ঘটুক। সেজন্য তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন তারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল যেন

না খায়। কিন্তু নারী তো চির-কৌতূহলী। এক অদম্য কৌতূহলী মন নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে। তার সমগ্র সত্তাকেই আচ্ছন্ন করে আছে এই কৌতূহলী মন। সেই সহজাত কৌতূহলের বশীভূত হয়েই প্রথম নারী ইভ আস্বাদন করেছিল সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল। পরিণামে যা ঘটেছিল তা সকলেরই জানা আছে। সেটা তো অভিশাপ হয়েই দাঁড়িয়েছিল। স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পতন, যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ও প্রজাসৃষ্টি।

কিন্তু হিন্দু পুরাণে প্রথম নারী এরকম কোন নিষেধাজ্ঞা দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়নি। সৃষ্টির সূচনাতেই তারা স্রষ্টা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিল 'তোমরা উভয়ে রমণে প্রবৃত্ত হয়ে প্রজাসৃষ্টি কর'। হিন্দু পুরাণে আছে জীবন-বিজ্ঞানের এক পরম সত্যের কথা। আদিতে স্ত্রী-পুরুষ বিভেদ ছিল না। বায়োলজিতেও আমরা সেই কথাই পড়ি। আদিতে তাদের ইনফিউসরিয়া, অ্যামেবা, স্পরোজোয়ান প্রভৃতি এককোষীয় রূপ ছিল। তাদের যৌনজীবন ছিল না। এককোষগুলিই শতধা হয়ে সৃষ্টি বজায় রাখত। তারপর আসে স্ত্রী-পুরুষ বিভেদ ও যৌনজীবন। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী আদিতে স্রষ্টার নিজের কোনো যৌন-সত্তা ছিল না। স্রষ্টা হচ্ছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনি প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন সনৎ-কুমার, সনন্দ, সনক, সনাতন ও বিভু নামক পাঁচ ঋষিকে। তখন স্ত্রী-পুরুষ বিভেদ ছিল না বলে তাদের থাকতে হয়েছিল ঊর্ধ্বরেতা হয়ে। সে অবস্থায় তো প্রজাসৃষ্টি হয় না। তাই ব্রহ্মা নিজেকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। তাঁর এক অংশ পুরুষ ও অপর অংশ নারী হল। পুরুষের তিনি নাম দিলেন মনু, আর নারীর নাম দিলেন শতরূপা। তাঁরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করল—'পিতঃ, কোন্ কর্মের দ্বারা আমরা আপনার যথোচিত সেবা করব ?' ব্রহ্মা বললেন, 'তোমরা মৈথুন কর্ম দ্বারা প্রজা উৎপাদন কর। তাতেই আমার তুষ্টি।' তখন থেকে মৈথুন কর্মের প্রবর্তন হল। মনু ও শতরূপার পুত্রকন্যা থেকেই মানবজাতির বিস্তার হল।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছিলেন। তন্ত্রমতে নারীর দুই স্বরূপ—কামিনী ও জননী। শেষের স্বরূপটাই ঠাকুর গ্রহণ করেছিলেন সারদামণি সম্পর্কে। কিন্তু একই নারীর আর-একটা স্বরূপ আছে বলে তিনি সংসারী ভক্তদের পরিহার করেননি। যাদের পক্ষে নৈতিক হিসাবের স্ত্রী ও জননী পৃথক সংস্কার, তাদের পক্ষে এ ধারণা করা খুবই কঠিন। একজন ভৈরবের কথায় বলি—মাতৃভাবই বলো আর কামিনীভাবই বলো, দুই তো আরোপিত ভাব, আসলে তো সে একই কামিনীর দুই রূপ বা ভাব। গোড়াতেই তো প্রকৃতি কামিনী, সৃষ্টিতে সম্ভোগার্থেই তার সার্থকতা। তারপর যখন সৃষ্টি হয়ে গেল, সেই সৃষ্ট জীবের অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় তার লালনপালন ও বৃদ্ধির জন্যই তো জননী-ভাবটি। নারীমাত্রই পরমাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তির অংশ। মনুষ্যসমাজের একটা নৈতিক সংস্কারকে সনাতন সত্য বলে মেনে নিলে তত্ত্বের দিক থেকে সত্য উদ্ধার করা অসম্ভব হবে। প্রকৃতির আসল ভাব অতি গুহ্য, অনির্বচনীয়। কেবলানন্দময়ী ভাব। তার বর্ণনা নেই। এজন্যই পরমহংসদেব একসময় মা-ঠাকরুনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আমি তোমার কে ?' সে প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি আমার আনন্দময়ী গো।'

এক কথায়, নারী আনন্দময়ী। কামিনী হিসাবেও সে আনন্দময়ী। জননী হিসাবেও সে আনন্দময়ী। কামিনীরূপে নারী সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী; জননীরূপে নারী সৃষ্ট জীবের পালয়িত্রী। সেজন্যই অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম দেখি। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি সন্তান-উৎপাদনের জন্য যৌনমিলনের একটা বিশেষ ঋতু আছে। মাত্র সেই ঋতুতেই তাদের মধ্যে যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা

জাগে। তখন স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে মিলিত হয়ে সন্তান-উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। পশুজগতে সন্তান-উৎপাদন এভাবে সীমিত না হলে সমস্ত পৃথিবীই তো পশুতে ভরে যেত। সেটা প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়। অন্যপক্ষে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষই জগৎ পরিপূর্ণ করুক—এটাই প্রকৃতির অভিপ্রেত। সেজন্যই মনুষ্যসমাজে সন্তান-উৎপাদনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ঋতু নেই। মানুষের ক্ষেত্রে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যৌনমিলনের বাসনা সকল ঋতুতেই জাগ্রত থাকে। এটা প্রকৃতির নির্দেশ। মানুষের ক্ষেত্রে নারীদেহ যেসব যৌন হরমোন (oestrogen) দ্বারা গঠিত হয় তাতে নারীর মনে যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা (oestrus) সবসময়েই জাগ্রত থাকে। সেজন্যই নারী সবসময়েই পুরুষের সান্নিধ্য কামনা করে। এক কথায়, মানুষের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকা এক সহজাত প্রবৃত্তি। সুতরাং কামিনী হিসাবে নারীর আনন্দময়ী হবার পিছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। আর জননী হিসাবে নারী আনন্দময়ী হয়ে যে বিরাজমান থাকে, তার পিছনেও বৈজ্ঞানিক কারণ বিদ্যমান। সে কারণটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল বা জীবজনিত কারণ। শিশুকে লালনপালন এবং স্বাবলম্বী করে তুলতে অন্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের অনেক বেশি সময় লাগে। এ-সময় প্রতিপালন ও প্রতিরক্ষণের জন্য নারীকে পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে হয়। এর জন্যই পরিবার-গঠনের প্রয়োজন হয়। মনে করুন, অন্য প্রাণীর মত যৌন-মিলনের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী-পুরুষ যদি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ত, তাহলে মনুষ্যসমাজে মা ও সন্তানকে কতই না বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হ'ত।

প্রসঙ্গত আগের অনুচ্ছেদে আমরা নারীদেহে বিশেষ যৌন হরমোন বা **oestrogen** থাকার কথা বলেছি। নারীদেহে এসব যৌন হরমোন

থাকার দরুন নারীমনে শুধুমাত্র যে যৌনমিলনের বাসনা শাশ্বত থাকে, তা নয়। নারীর সমস্ত দেহগঠনের ওপর এবং বিশেষ করে নারীদেহের আনুষঙ্গিক (secondary) বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ওপরও এর প্রভাব বিস্তারিত হয়। এই প্রভাবের দরুনই নারীদেহ পুরুষদেহ থেকে পৃথকভাবে গঠিত হয়। তবে কতকগুলি গ্রন্থি বা glands-ও—এই বৈশিষ্ট্য রচনায় সাহায্য করে। প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যৌনযন্ত্রের। সন্তান ছেলে না মেয়ে সেটা প্রকাশ পায় তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। সেটা যোনি-চিহ্ন থেকেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সেটা বাহ্যিক চিহ্নমাত্র। গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নারীদেহের অভ্যন্তরে গ্রথিত থাকে। নারীদেহের অভ্যন্তরে যে সহজাত বৈশিষ্ট্যমূলক যন্ত্র থাকে, তা হচ্ছে ডিম্বাশয় (ovary) ও গর্ভাশয় বা জরায়ু (uterus)। দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত, তার মানে প্রথম রজঃনিঃসরণের সময় পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েরা নিজেদের পরস্পরের সমকক্ষ মনে করে। সে সময় পর্যন্ত তারা পরস্পরের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা ও খেলাধুলা করে এবং দৈহিক শক্তি প্রদর্শনে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু তারপর যখন আনুষঙ্গিক লক্ষণসমূহ (secondary characters) প্রকাশ পায়, তখন তারা বুঝতে পারে যে তারা পরস্পরের সমকক্ষ নয়। মেয়েদের এ-সকল আনুষঙ্গিক লক্ষণ হচ্ছে মাসিক রজঃনিঃসরণ, স্তনের স্ফীতি এবং সন্তান-প্রজননের পর সেই স্ফীত-স্তন দুগ্ধভাণ্ডারে পরিণত হওয়া, মুখমণ্ডলে কেশের অভাব ইত্যাদি। অপরপক্ষে, পুরুষের এরূপ মাসিক রজঃনিঃসরণ হয় না, স্তনের স্ফীতি ঘটে না এবং মুখমণ্ডল কেশাচ্ছন্ন হয়।

জরায়ুই হচ্ছে মেয়েদের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র, কেননা এরই মধ্যে ভ্রূণোদগম হয়ে শিশু তার অবয়বের পূর্ণতা পায়। প্রতিবার মাসিক রজঃনিঃসরণের সময় ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নির্গত হয়। সে সময় যৌনমিলনের ফলে পুরুষের শিশ্ন-নির্গত শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত বা

ফলবতী করে। তখন সেই নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে ভ্রূণ সৃষ্টি করে।

সুতরাং জরায়ু ও ডিম্বাশয় নারীদেহে এক বায়োলজিক্যাল কারখানা-বিশেষ। এ কারখানার মালিকানা-স্বত্ব একমাত্র নারীর। কিন্তু এ কারখানা সম্পূর্ণ অচল ও অকর্মণ্য অবস্থায় থাকে যদি-না সে পুরুষের সংস্পর্শে আসে। সেজন্য জননী হতে হলে নারীকে সম্পূর্ণ পুরুষনির্ভর হতে হয়।

অবশ্য মেয়েরা মুখ্যভাবে পুরুষনির্ভর না হয়েও জননী হতে পারে। সেটা নলের (test tube) সাহায্যে। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে নলজাতককে নিয়ে নানারূপ উৎকট সামাজিক সমস্যা উঠতে পারে। যথা, সে শিশুর প্রকৃত পিতা কে? সে শিশু বৈধ, না অবৈধ? সোশিওলজিক্যালি সে শিশু হয়ত বৈধ, কিন্তু আদালত বলবে যে বায়োলজিক্যালি সে-শিশু অবৈধ। তাহলে সে-শিশুকে তো ললাটে জারজ সন্তানের কালিমা নিয়েই জন্মগ্রহণ করতে হয়।

ꕥ ꕥ ꕥ

মানুষের আবির্ভাবের দিন থেকেই তো মেয়েরা পুরুষ ভজছে। সে কত দিন? মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে আজ থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে। আবির্ভাবের সময় থেকেই মানুষকে দুই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল—আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহের সমস্যা। মানুষকে বলা হয় বুদ্ধিসম্পন্ন জীব বা **homo sapiens**। কিন্তু গোড়া থেকেই মানুষকে আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহ-সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলে তার সমাধানের জন্য তাকে কারিগর বা **homo faber**-ও হতে হয়েছিল। ফলমূল ছাড়া তার প্রধান খাদ্য ছিল মাংস। মাংস আহরণের জন্য তাকে পশুশিকারে বেরুতে হ'ত। পশুশিকার ও আত্মরক্ষা—এই উভয়ের জন্যই তাকে আয়ুধ তৈরি করতে হ'ত। এ আয়ুধগুলো মানুষ পাথর দিয়ে

তৈরি করত। আয়ুধগুলো পুরুষরাই তৈরি করত। তাতে মেয়েদের কোনো ভূমিকা ছিল না। সেজন্যই প্রথম মানুষের বৈষয়িক জীবনে পুরুষের প্রাধান্য এসে পড়েছিল। যেহেতু একমাত্র পুরুষই হচ্ছে **homo faber** ও বৈষয়িক কর্মকাণ্ডের হর্তাকর্তা, সেহেতু নারীকে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে পুরুষের বশীভূত হয়ে থাকতে হ'ত। নারীর তখন মাত্র একটাই সত্তা ছিল। সেটা হচ্ছে তার বায়োলজিক্যাল সত্তা। আর পুরুষের ছিল দুটো সত্তা—বায়োলজিক্যাল ও বৈষয়িক বা ইকনমিক সত্তা। পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই নারী তখন থেকেই পুরুষ-ভজনা শুরু করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নারী পুরুষ-ভজনা করতে শুরু করেছিল দুই কারণে। প্রথমত, তার বায়োলজিক্যাল সত্তাকে রূপায়িত করবার জন্য সন্তান-উৎপাদনে পুরুষের সহযোগিতা। আর দ্বিতীয়ত, নারীকে ও তার সন্তানদের পুরুষ রক্ষা করে এবং তাদের জন্য খাদ্যসংগ্রহ করে দেয়। সেজন্য নারীর কাছে পুরুষ নমস্য হয়ে দাঁড়ায় এবং নারী তার প্রেম ও সোহাগ দিয়ে পুরুষকে নিজ সান্নিধ্যে বেঁধে রাখতে সচেষ্ট হয়। নারী তার বায়োলজিক্যাল সত্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাতেই তার সন্তুষ্টি। তাতেই তার আনন্দ।

পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে তার আবির্ভাবের সময় থেকে চার লক্ষ নব্বই হাজার বৎসর পর্যন্ত নারী এভাবেই পুরুষের বশীভূত হয়ে থাকে। এই চার লক্ষ নব্বই হাজার বৎসরকে প্রত্নপলীয় যুগ বলা হয়। তারপর নবপলীয় যুগের সূচনা হয়। নবপলীয় যুগেই নারীর বায়োলজিক্যাল সত্তা ছাড়া আর একটা সত্তা প্রকাশ পায়। এটা হচ্ছে তার বৈষয়িক বা ইকনমিক সত্তা। এটা কী ভাবে ঘটেছিল তা এবার বলছি।

আগেই বলেছি যে, প্রত্নপলীয় যুগে মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল পশুমাংস। পশুশিকার ছিল পুরুষের কর্ম। পশুশিকারের জন্য তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হ'ত। এজন্য সে-যুগের মানুষ ছিল

যাযাবর। কোনো এক জায়গার পশুসম্পদ নিঃশেষিত হলে তাকে আবার নতুন জায়গায় যেতে হ'ত। অনেকসময়ে শিকারে বেরিয়ে পড়ার পর পুরুষের ফিরতে দেরি হ'ত। এরকম সময়ে মেয়েরা ক্ষুধার তাড়নায় গাছের ফল, এবং ফলাভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যশস্য খেয়ে প্রাণধারণ করত। তারপর মেয়েদের ভাবনা-চিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা। সন্তান-উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থায় শস্য উৎপাদন করে, সেইহেতু তারা ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নেয়। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে—পুরুষ যদি নারীরূপ-ভূমি (আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই মেয়েদের 'ক্ষেত্র' বা ভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করতে পারে, তবে মাতৃরূপ-পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেন ? তখন তারা পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ এক যষ্টি বানিয়ে নিয়ে ভূমিকর্ষণ করতে থাকে। এখনও পৃথিবীর অনেক আদিম জাতি এরূপ কর্ষণ-যষ্টি দ্বারাই ভূমি কর্ষণ করে। **Przyluski** তাঁর **'Non-Aryan Loans in Indo-Aryans'** প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 'লিঙ্গ', 'লাঙ্গুল' ও 'লাঙ্গল' এই তিনটি শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন। মেয়েরা এইভাবে ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করল। যখন ফসলে মাঠ ভরে গেল তখন পুরুষরা তা দেখে অবাক হল। লক্ষ্য করল যষ্টি হচ্ছে **passive**, আর ভূমিরূপী পৃথিবী ও তাদের মেয়েরা হচ্ছে **active**। **Active** মানেই হচ্ছে শক্তির আধার। ফসল তোলার পর যে প্রথম নবান্ন উৎসব হল, সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা। এ সম্বন্ধে **Clodd** তাঁর **'Animism'** গ্রন্থে বলেছেন, **'...in earth worship is to be found the explanation of the mass of rites and ceremonies to ensure fertilization of the crops and cattle and woman herself.'**

(কী ভাবে লিঙ্গ ও শক্তিপূজার উদ্ভব হল, সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ও

ব্যাখ্যা অবগত হবার জন্য বর্তমান লেখকের 'Pre-Aryan Elements in Indian Culture' দ্রষ্টব্য।)

কৃষির উদ্ভবের পরই মানুষ তার যাযাবর জীবন ছেড়ে দিয়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করল। গ্রাম, এবং গ্রামের পর নগরের পত্তন ঘটল। মেয়েরা শুধু কৃষিরই উদ্ভব ঘটালো না, তারা বয়নবিদ্যা দ্বারা ঝুড়ি-চুপড়ি থেকে আরম্ভ করে বস্ত্রবয়ন পর্যন্ত আরম্ভ করল। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম সূক্তে বলা হয়েছে : 'মেয়েরাই বস্ত্রবয়ন করতে জানে, আমরা জানি না।' অনেক নৃতত্ত্ববিদ বলেন যে, কুলালের কাজও মেয়েরাই প্রথম শুরু করেছিল। এক কথায়, সভ্যতার সূচনা মেয়েদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল। এসবই ঘটেছিল নবপলীয় যুগে।

মেয়েরা এখন আর মাত্র বায়োলজিক্যাল জীব নয়। তারা কৃষ্টির জগতে ঘটাল এক বিস্ফোরণ। মানুষের জীবনের জয়যাত্রার পথে তারা হয়ে দাঁড়াল পুরুষের সক্রিয় সহযাত্রী। তারা এখন 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'। সে সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অনেকে সচেতন হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রব তুললো—'আমাদের দাবি মানতে হবে।' কিসের দাবি ? কর্ষিত ভূমির দাবি। তারা বললো, যেহেতু তারাই ভূমি কর্ষণ করে ফসল উৎপাদন করেছে, ভূমির মালিকানা-স্বত্ব তাদের। তারা আরও বললো, যেহেতু ইহজগতে মাতাই সন্তানকে প্রসব করে এবং মাতাই সন্তানকে লালন-পালন করে, সেইহেতু সন্তানও মায়ের। প্রথম প্রথম পুরুষদের সে দাবি মেনে নিতে হল। এইভাবে উদ্ভূত হল মাতৃকেন্দ্রিক (matrilineal) সমাজ, অর্থাৎ যে সমাজে উত্তরাধিকার ও বংশপরিচয় মাতার দিক দিয়েই নির্ণীত হয়। এরূপ সমাজ বিক্ষিপ্ত-ভাবে জগতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এসব সমাজে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতাকে ধরেই নেমে আসে। অর্থাৎ পারিবারিক

সম্পত্তির মালিকানাস্বত্ব হয় মায়ের। মায়ের মৃত্যুর পর সে সম্পত্তি পায় মেয়ে, ও তারপরে মেয়ের মেয়ে। জগতের দু-চার জায়গায় এরূপ সমাজের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে উনবিংশ শতাব্দীতে সুইটজারল্যাণ্ডের নৃতত্ত্ববিদ বাখোফেন (১৮১৫-৮৭) সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে একসময় মাতৃশাসিত সমাজ (matriarchal society) ছিল। অর্থাৎ তখন মেয়েরাই পুরুষের ওপর আধিপত্য করত। কিন্তু পরবর্তীকালের নৃতত্ত্ববিদরা এ মতবাদ বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে কোনো সময়েই মাতৃশাসিত বা নারীশাসিত সমাজ ছিল না। যা ছিল এবং এখনও কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে মাতৃকেন্দ্রিক (matrilineal) সমাজ। এসব সমাজে উত্তরাধিকার বংশপরম্পরায় মাতাকে ধরেই নেমে আসে। এরকম সমাজ আমাদের দেশে কেরল-এ নায়ারদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু এসব সমাজে পরিবার বা গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য থাকে পুরুষের (মাতার ভ্রাতার), মেয়েদের নয়। বলা যায়, পরিবার বা গোষ্ঠী মাতৃশাসিত হয় না, কেবল পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত সম্পত্তির মালিকানা মাতৃগত হয়। এসব সমাজের বিবাহপদ্ধতি লক্ষ্য করলেই এটা বুঝতে পারা যায়। আমি এখানে কেরল-এর মাতৃকেন্দ্রিক নায়ার সমাজের বিবাহপদ্ধতির বর্ণনা দিচ্ছি। নায়াররা ক্ষত্রিয়। নায়ার কুমারীদের যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে নিজ জাতির কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়। পরে এই বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নায়ার মেয়েরা পিতৃকেন্দ্রিক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক বিচিত্র যৌনসম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এরূপ সম্পর্ককে 'সম্বন্ধম' বলা হয়। 'সম্বন্ধম'-সম্পর্ক অবিনশ্বর নয়। অনেকসময় কোনো কোনো নায়ার রমণীকে পর পর দশ-বারো জন নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের সঙ্গে 'সম্বন্ধম'-সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখা যায়। এখানে বলা দরকার, প্রথম বিবাহের পর নায়ার রমণী কখনও তার স্বামীর পরিবারে

বাস করতে যায় না। স্বামীই স্ত্রীর পরিবারে কখনও কখনও রাত্রিবাস করতে আসে। আবার যখন 'সম্বন্ধম'-সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনও নায়ার রমণী কখনও তার নাম্বুদ্রি প্রণয়ীর গৃহে বাস করতে যায় না। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণও কখনও তার নায়ার প্রণয়িনীর গৃহে বাস করতে আসে না। সাধারণত নাম্বুদ্রি প্রণয়ী সন্ধ্যার পর যৌনমিলনের জন্য নায়ার রমণীর গৃহে আসে এবং মিলনান্তে পুনরায় নিজ পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারে ফিরে যায়। অনেকসময় নায়ার রমণী একই কালে একাধিক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের সঙ্গে 'সম্বন্ধম'-সম্পর্ক স্থাপন করে। এরূপ ক্ষেত্রে এমন আচরণ বহুপতিক (polyandrous) রূপ ধারণ করে। যেক্ষেত্রে 'সম্বন্ধম'-সম্পর্ক এভাবে বহুপতিক রূপ ধারণ করে, সেক্ষেত্রে সকল পুরুষেরই ওই নায়ার রমণীর ওপর সমান যৌনাধিকার থাকে। একজন প্রণয়ী এসে দ্বারদেশে যদি অপর প্রণয়ীর ঢাল বা বর্শা দেখতে পায় তাহলে সে প্রত্যাগমন করে এবং পরবর্তী সন্ধ্যায় পুনরায় নিজের ভাগ্যপরীক্ষা করতে আসে।

মাতৃকেন্দ্রিক নায়ার পরিবারের মধ্যে বিবাহিতা মেয়ের স্বামী, যেমন সেই পরিবারের মধ্যে বাস করে না, সেরূপ বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীও সেই পরিবারের মধ্যে বাস করতে আসে না। 'সম্বন্ধম' ছাড়াও নায়ারদের মধ্যে নিয়মানুগ সাধারণ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। তবে নায়ার স্ত্রীরা স্বামিগৃহে গিয়ে বাস করে না। সেক্ষেত্রে নায়ার স্বামী সন্ধ্যার পর স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলনের জন্য স্ত্রীর গৃহে এসে উপস্থিত হয়।

মাতৃকেন্দ্রিক নায়ার পরিবারের মেয়েদের সন্তানের অভিভাবক হচ্ছে মাতুল। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে মাতৃকেন্দ্রিক (matrilineal) সমাজ মাতৃশাসিত (matriarchal) নয়। তার মানে পুরুষরাই সেই সমাজের অধিপতি। তবে স্ত্রীলোক সমাজ বা রাষ্ট্রের অধিপতি হলেই যে সে-সমাজ মাতৃশাসিত (matriarchal) হবে, তা নয়। তা যদি হবে, তাহলে রানী এলিজাবেথের আমলে ইংরেজ সমাজ

বা ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে ভারতীয় সমাজকে মাতৃ-শাসিত (matriarchal) সমাজ বলতে হয় ! বস্তুত নৃতত্ত্ববিদগণ পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপ পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যদিও মাতৃকেন্দ্রিক (matrilineal) সমাজ জগতের স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়েছে, বাখোফেনের কল্পিত মাতৃশাসিত (matriarchal) সমাজের সন্ধান আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। সুতরাং কৃষির উদ্ভবের পর মেয়েরা কোনো কোনো জায়গায় ভূমির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে যে দাবি তুলেছিল এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সে দাবি মেনে নেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তারা পুরুষশাসিত সমাজেই বাস করত।

দেবতামণ্ডলীতে মাতৃদেবীর প্রাধান্য মাতৃশাসিত (matriarchal) সমাজের ইঙ্গিত করে না। আমরা দেখি যে, কৃষির উদ্ভাবনের পর যখন মহাদেবীর (the Great Mother) পূজার সূচনা হয়েছিল, তখন মাতৃদেবীকে 'কুমারী' (virgin goddess) দেবতারূপে কল্পনা করা সত্ত্বেও ওই কুমারী-মাতৃদেবীকে একজন ভর্তা দেওয়া হয়েছিল। এটা আমরা প্রাচীন সুমের ও ভারত—এই উভয় দেশেই লক্ষ্য করি। ভারতে মাতৃদেবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পূজা হচ্ছে দুর্গাপূজা। দুর্গা শিবজায়া হিসাবে কল্পিত হলেও আদিতে তিনি যে কুমারী—তা মহাষ্টমীর দিন 'কুমারী-পূজা' থেকেই বুঝতে পারা যায়।

আমাদের মূল প্রশ্ন—'মেয়েরা কেন পুরুষ ভজে?'—সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বিশেষ আলোকপাত করে। দেবীর উদ্ভবের কাহিনীটিই এখানে বিবৃত করা যাক। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। প্রতিবারেই দেবতারা পরাহত হচ্ছিল। এমন হল যে অসুরাধিপতি মহিষাসুর দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নিল। তখন দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে

তাদের দুর্গতির কথা জানাল, এবং এই বিপর্যয় থেকে তাদের রক্ষা করবার অনুরোধ করল। তখন বিষ্ণু দেবতাদের উপদেশ দিলেন—তোমরা সকলে নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজ নিজ তেজের কাছে প্রার্থনা কর যে তোমাদের সমবেতভাবে উৎপন্ন তেজ থেকে যেন এক নারীমূর্তি আবির্ভূতা হন। সেই নারীই এই অসুরকে বধ করবেন। সমবেত তেজ থেকে যে নারীমূর্তি আবির্ভূতা হলেন, তিনিই দুর্গা। দেবী মহিষাসুরের কাছে এলে, মহিষাসুর দেবীকে বলল—আপনার হাতে মরতে আমার কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু আমি যেন আপনার সঙ্গে পূজিত হই। এই কাহিনী থেকে দুটি জিনিস পরিষ্কার পরিস্ফুট হচ্ছে। প্রথম, জগৎ রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মিলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর দ্বিতীয়, পুরুষ যেন নারীর সঙ্গে সমান পূজা পায়। এখানে নারীর কামিনী ও জননী—এই দুই ভাবেরই সমন্বয় দেখি।

শিবজায়া সম্বন্ধে আর-এক পৌরাণিক কাহিনী শুনুন। শিব প্রথমে দক্ষরাজ-কন্যা সতীকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু পিতার যজ্ঞস্থলে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করে। পরে সতী হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এবং মহাদেবকে পাবার জন্য কঠোর তপস্যায় রত হয়। এদিকে দেবতারা তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে জানতে পারে যে মহাদেবের ঔরসে যে পুত্র জন্মাবে, সেই-ই তারকাসুরকে বধ করবে। সেজন্য পার্বতী ও মহাদেবের মিলন ঘটাতে মদন আসে, কিন্তু সে মহাদেবের কোপে ভস্মীভূত হয়। তারপর পার্বতী ও মহাদেবের মিলন হলে মদন পুনর্জীবন লাভ করে। এই মিলনের ফলেই কার্তিকেয়র জন্ম হয় এবং কার্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করে। এসব পৌরাণিক কাহিনীতে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যেই নিহিত আছে 'প্রমীলা কেন পুরুষ ভজে ?'—এই প্রশ্নের উত্তর।

ঌ ঌ ঌ

পৌরাণিক যুগের পূর্বে বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগের মেয়েরা কি করত, সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলি। সাধারণ বিবাহ তো বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিলই, কিন্তু অনেকসময় মেয়েরা নিজেরাই স্বামী নির্বাচন করে নিত। এটা ঘটত 'সমন' উৎসবে। ঋক্ ও অথর্ব বেদে এবং যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় এই উৎসবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ উৎসবটি অনেকটা 'অলিম্পিক' উৎসবের মত ছিল। এই উৎসবে যে যে-বিষয়ে দক্ষ, সে সে-বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নিজ কৌশল দেখিয়ে পুরস্কার লাভ করত। ধনুর্বেত্তা, রথী, অশ্বারোহী, কবিগণ, মল্ল ও নটগণ, শস্ত্রজীবী সকলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হ'ত। এটা সর্বজনীন উৎসব ছিল এবং সেই কারণে নানারকম আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হ'ত। বারাঙ্গনারাও এই উৎসবে ধনলাভের আশায় উপস্থিত থাকত। কিন্তু যেটা আমাদের প্রাসঙ্গিক ব্যাপার, সেটা হচ্ছে কুমারী মেয়েরা মনোমত পতিলাভের আশায় সুসজ্জিতা হয়ে তথায় উপস্থিত থাকত ও পতি-নির্বাচন করত। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের দুয়ের সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে বলা হয়েছে, এরূপ কুমারীরা যুবতী মেয়ে হ'ত। সুতরাং এ-থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বৈদিক যুগে যুবতী কুমারী মেয়েরা কোন্ পুরুষকে ভজবে তা নিজেরাই নির্বাচন করত। সে অধিকার তাদের ছিল। মনে হয়, পরবর্তীকালে এটাই স্বয়ংবরপ্রথার রূপ নিয়েছিল। স্বয়ংবরপ্রথাতেও পুরুষকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে নিজ কৌশল প্রদর্শন করতে হ'ত। তবেই অনূঢ়া কন্যা কোন্ পুরুষকে ভজনা করবার জন্য গ্রহণ করবে, তা স্থিরীকৃত হ'ত। 'সমন' উৎসবে যেমন স্ব-ইচ্ছা ও স্ব-মনোনয়নের একটা মূল্য ছিল, স্বয়ংবরপ্রথায় তা ছিল না। তবে পরবর্তীকালে স্বেচ্ছায় কোনো পুরুষকে ভজনা করার রীতি যে একেবারে ছিল না, তা নয়। তখন মেয়েরা যে পুরুষকে ভজনা করত, তাকে দিয়ে একটা শর্তপালন স্বীকার করিয়ে নিত। এটা আমরা

গঙ্গা-শান্তনু ও শকুন্তলা-দুষ্মন্তের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি। প্রেমে পড়ে পুরুষরা সে-সব শর্ত মেনে নিত।

তবে মেয়েরা যে একজন পুরুষকেই ভজনা করত, তা নয়। কোনো কোনো সময়ে একসঙ্গে অনেক পুরুষকেও ভজনা করত। এটা আমরা পূর্বে উল্লিখিত নায়ার রমণীদের ক্ষেত্রে দেখেছি। বৈদিক যুগে আমরা জটিলাকে এরূপ করতে দেখি। জটিলার ছয় স্বামী ছিল। আবার মহাভারতীয় যুগে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল। পরবর্তীকালের সমাজে একাধিক পুরুষকে ভজনা করবার ঘটনা হামেশাই ঘটেছে, তবে স্বামী-অন্তর পুরুষকে উপপতি বলা হ'ত। এরূপ সম্পর্কের কথা আমরা পরে আলোচনা করব। উপস্থিত আমরা স্মৃতির যুগে যেতে চাই।

স্মৃতির যুগে মেয়েদের পুরুষ-ভজনা নানারকম বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখি। বিবাহ-ই পুরুষ-ভজনার একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বিবাহপ্রথার উদ্ভবের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমাজ-স্বীকৃত যৌনসম্পর্ককেই 'বিবাহ' বলা হয়। মানুষের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে স্ত্রী ও পুরুষ পরিবার গঠন করে বাস করত বটে, কিন্তু 'বিবাহ' নামে এর কোনো সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না। মনে হয় এটা এসেছিল একই নারীকে নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও রক্তপাতের পদক্ষেপে। এরূপ দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও রক্তপাত এড়াবার জন্যই 'বিবাহপ্রথা'র উদ্ভব হয়েছিল। এরূপ দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও রক্তপাত প্রত্নোপলীয় যুগে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পশুশিকারের জন্য পুরুষকে তখন দূর-দূরান্তরে যেতে হ'ত। নারীকে তখন অসহায় অবস্থায় থাকতে হ'ত। নারীর সেই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে অন্য পুরুষের পক্ষে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া একটা সম্ভবপর স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। এটা এড়াবার জন্যই মনে হয় মনুষ্যসমাজে পরিবারকে

স্বীকৃতি দেবার একটা প্রয়োজন হয়েছিল। নৃতত্ত্ববিদগণ 'বিবাহপ্রথা'র উদ্ভবের এই কারণই দেন।

মহাভারতে এ-সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে সেটা উল্লেখ করা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। সে কাহিনী উল্লেখ করে, পরে আমি এ-সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। মহাভারতের আদিপর্বে উল্লেখিত এই কাহিনীটিকে শ্বেতকেতু-কাহিনী বলা হয়। কাহিনীটি হচ্ছে এই : একদিন শ্বেতকেতু যখন পিতামাতার কাছে বসে ছিল তখন এক ব্রাহ্মণ এসে তার মায়ের সঙ্গে যৌনমিলন কামনা করে তাকে কক্ষান্তরে নিয়ে যায়। শ্বেতকেতু এতে ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু পিতা উদ্দালক বলেন, স্ত্রীলোক গাভীর মত স্বাধীন। সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম হয় না। এটাই সনাতন ধর্ম। এই অবাধ যৌনমিলন নিবৃত্ত করবার জন্যই শ্বেতকেতু ভারতবর্ষে প্রথম বিবাহপ্রথার প্রবর্তন করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নৃতত্ত্ববিদগণ, যথা—বাখোফেন (Bachofen) মরগান (Morgan) প্রমুখ বলতেন যে, আদিম অবস্থায় মনুষ্যসমাজে অবাধ-যৌনমিলন (promiscuity) প্রচলিত ছিল। তাঁদের মত অনুযায়ী বিবাহপ্রথা উদ্ভব হবার পূর্বে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোনোরূপ স্থায়ী যৌনসম্পর্ক ছিল না। তাঁরা বলতেন যে অন্যান্য পশুর মত মানুষও অবাধ-যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হ'ত। তাঁদের মতে আদিম অবস্থায় মানুষের মধ্যে যৌনাচার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো অনুশাসন ছিল না। তাঁরা বলতেন যে অনুশাসনের উদ্ভব হয়েছিল অতি মন্থরগতিতে, ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে। তাঁদের সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে নানারকম বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে তাঁরা এক বিবর্তনের ঠাটে সাজিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, মানুষের বর্তমান একপত্নীক বিবাহপ্রথা এইসকল ক্রমিক স্তরের ভেতর দিয়ে বিকাশলাভ করেছে। কিন্তু সন্তানকে লালন-পালন ও স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য মানুষের যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, একমাত্র এই জীবজনিত কারণই এ-কথা

প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক যে, মনুষ্যসমাজে গোড়া থেকেই স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে থাকত। বস্তুত আদিম অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ যে অবাধ যৌনাচারে রত ছিল, এই মতবাদ পূর্বোক্ত নৃতত্ত্ববিদ-গণের এক নিছক কল্পনামূলক অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ অবাধ যৌনমিলন মনুষ্যসমাজে কোনোদিনই প্রচলিত ছিল না। এমনকি বর্তমান সময়েও অত্যন্ত আদিম অবস্থায় অবস্থিত অরণ্যবাসী জাতি-সমূহের মধ্যেও অবাধ যৌনমিলনের রীতি নেই। বস্তুত এইসকল অরণ্যবাসী জাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তা অতি কঠোর অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির মধ্যে পর্যবেক্ষণ করলেও আমরা এর সমর্থন পাই। বনমানুষ, গরিলা প্রভৃতি যে-সকল নরাকার জীব আছে, তারাও দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করে। কখনও অবাধ মিলনে রত হয় না। এইসকল কারণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 'বিবাহ' আখ্যা দিয়ে তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, স্ত্রী-পুরুষ একত্রে মিলিত হয়ে 'পরিবার' গঠন করে সহবাস করবার রীতি মনুষ্যসমাজে গোড়া থেকেই প্রচলিত ছিল (লেখকের 'ভারতে বিবাহের ইতিহাস', তৃতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ওয়েস্টারমার্ক (**Westermarck**) বলেন, 'পরিবার গঠন করে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বাস করা থেকেই বিবাহপ্রথার উদ্ভব হয়েছে ; বিবাহপ্রথা থেকে পরিবারের সূচনা হয়নি।' মহাভারতে বিবৃত শ্বেতকেতু-উপাখ্যান থেকেও আমরা এর সমর্থন পাই। কেননা, বিবৃত কাহিনী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিবৃত কাহিনীর আগেই শ্বেতকেতু তার পিতামাতার সঙ্গে পরিবার-মধ্যেই বাস করত।

স্মৃতির যুগে মেয়েদের পুরুষ-ভজা কী ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। স্মৃতির যুগে

মেয়েদের পুরুষ-ভজনা স্মৃতিকারদের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণমূলক গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। বৈদিক যুগে যে-কোনো মেয়ে যে-কোনো পুরুষকে ভজনা করতে পারত। এ-বিষয়ে কোনোরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধ ছিল না। কিন্তু চাতুর্বর্ণ্য সমাজের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এ-বিষয়ে বিধিনিষেধ এসে যায়। পুরুষ-নির্বাচন সম্বন্ধে নারী তার স্বাধীনতা হারায়। নিজ বর্ণের মধ্যে ভজনা করাই 'বিধিসম্মত যৌনাচার' বলে পরিগণিত হয়। তবে নিজ বর্ণের বাইরে যে বিবাহ করতে পারত না, তা নয়। নিজ বর্ণের বাইরেও বিবাহ করতে পারত। সে-রকম বিবাহকে 'অনুলোম' ও 'প্রতিলোম' বিবাহ বলা হ'ত। যখন কন্যা নিজ বর্ণ অপেক্ষা উচ্চবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করত, তাকে অনুলোম বিবাহ বলা হ'ত। আর উচ্চবর্ণের কন্যা যখন নীচবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করত, তখন তাকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হ'ত। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহে উৎপন্ন সন্তানের ললাটে পড়ত কালিমা। কেননা, এরূপ অসবর্ণ বিবাহের ফলে বহু সঙ্কর জাতির উদ্ভব ঘটেছিল ও সমাজ এক সম্প্রসারিত রূপ ধারণ করেছিল। নতুন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে এরূপ অসবর্ণ মিলনের ফসল হিসাবে যে-সকল নতুন জাতির উদ্ভব ঘটেছিল. তাদের স্থান ও মর্যাদা নির্দেশের পিছনে ব্রাহ্মণদের বেশ কিছু উষ্মা ছিল। কেননা, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যদি পিতা হতেন, তাহলে তাকে অম্বষ্ঠ বা উগ্র নামে অভিহিত করে সমাজে উচ্চ স্থান দেওয়া হ'ত। আর ব্রাহ্মণকন্যা যদি মাতা হতেন এবং পিতা শূদ্র হতেন, তাহলে তাঁদের সন্তানদের চণ্ডাল নাম দিয়ে সমাজের একেবারে নীচে তার স্থান নির্দিষ্ট হ'ত। এককথায়, চণ্ডালের মা হ'ত ব্রাহ্মণকন্যা, আর অম্বষ্ঠের পিতা হ'ত ব্রাহ্মণ। যেহেতু পিতৃকেন্দ্রিক সমাজে নারীর কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না, সেজন্য ব্রাহ্মণকন্যাকে সমাজের এই বিধান মাথা পেতে নিতে হ'ত (লেখকের 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' দ্রষ্টব্য)।

স্মৃতিকারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাহ ছিল ধর্মবিহিত কর্তব্যকর্ম বা

'সংস্কার'। সকল ব্যক্তির পক্ষেই এই কর্তব্যপালন বাধ্যতামূলক ছিল, বিশেষ করে পুত্র উৎপাদন করে নরক থেকে পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য। কেননা, সে-যুগের বুলিই ছিল 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। যদিও মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে আটরকম বিবাহের কথা বলা হয়েছে, এবং আপস্তম্ব ও বশিষ্ঠ ছয়রকম বিবাহের অনুমোদন করেছেন, তথাপি নীতির কারণে মাত্র সেই বিবাহকেই শাস্ত্রসম্মত বিবাহ বলে গণ্য করা হ'ত, যে-বিবাহে মন্ত্র উচ্চারিত হ'ত, হোম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ত ও সপ্তপদীগমন অবলম্বিত হ'ত। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই বিবাহই ছিল প্রশস্ত বিবাহ। তবে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে আসুর-বিবাহের প্রচলন ছিল। আসুর-বিবাহে মূল্যদান করে কন্যার পাণিগ্রহণ করা হ'ত। সেজন্যই 'মানবগৃহ্যসূত্রে' বলা হয়েছে যে, বিবাহ মাত্র দুইপ্রকার—ব্রাহ্ম ও আসুর। যদিও মহাভারতীয় যুগে 'গান্ধর্ব' ও 'রাক্ষস' বিবাহ আদর্শ-বিবাহ বলে গণ্য হ'ত, স্মৃতির যুগে এই উভয়প্রকার বিবাহ অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে, এরূপ বিবাহ করলে মানুষকে মহাপাপে লিপ্ত হতে হয়।

স্মৃতির যুগে মেয়েদের বিবাহ যে কেবল সর্বজনীন ছিল, তা নয়—বিবাহ বাধ্যতামূলকও ছিল। অর্থাৎ স্মৃতির যুগে মেয়েদের পুরুষ-ভজনা করতেই হ'ত। যথাসময়ে মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মেয়েদের পক্ষে বিবাহের উপযুক্ত বয়স হচ্ছে দশ, যখন মেয়ে 'কন্যা' আখ্যালাভ করে। পরাশর বিধান দিয়ে বলেছেন—'যথাসময়ে যদি মেয়ের বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহলে সেই কন্যার মাসিক রজঃ অপর জগতে তার পিতৃপুরুষদের পান করতে হয়, এবং যে তাকে বিবাহ করে তাকে হতভাগা হতে হয়।' বশিষ্ঠ, বৌধায়ন, নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য এ সম্পর্কে বেশ রুষ্ট হয়েই বলেছেন, 'কুমারী অবস্থায় কন্যা যতবার রজঃস্বলা হবে, ততবার তার পিতামাতা ও অভিভাবকদের

ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে।' গৌতম এ-সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিকারদের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করে বলেছেন, 'রজঃস্বলা হবার আগেই কন্যার বিবাহ হওয়া চাই।'

এখানে স্মৃতিযুগের প্রধান বুলি 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'র সঙ্গে স্মৃতিকারদের বিধানের একটা বিরোধ দেখা যায়। কেননা, পুত্র-উৎপাদনের জন্যই যদি ভার্যারূপে নারীর প্রয়োজন হয়, তবে বিবাহের জন্য সে-নারীকে কেন প্রয়োজন হয় রজঃস্বলা হবার পূর্বে? এটা তো বায়োলজিক্যাল-বিরোধী বিধান। কেননা, নারী রজঃস্বলা না হওয়া পর্যন্ত কখনও পুত্র-প্রজননে সমর্থা হয় না। সেদিক থেকে বৈদিক যুগের নারীর বিবাহ অনেক পরিমাণে যুক্তিসম্মত ছিল, কেননা বৈদিক যুগে সমর্থা যুবতী মেয়েরই বিবাহ হ'ত।

আজকের দিনে নারী অবশ্য স্মৃতিযুগের বায়োলজি-বিরোধী বিধানের শিকার নয়। ফুলমণির সেই শোকাবহ দুর্ঘটনার পর ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে বিবাহে সঙ্গমের বয়স বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বিবাহের ন্যূনতম বয়সও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিবাহের এই ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধির ফলে আজকের দিনে মেয়ে-পুরুষের বিবাহের বয়স ক্রমশই ঊর্ধ্বগতি লাভ করছে। এ-বিষয়ে মেয়ে-পুরুষ আজ সমান। পিতৃশাসিত সমাজের মধ্যে বাস করলেও বিবাহের বয়স সম্বন্ধে মেয়ে-পুরুষ আজ সমান রীতির অধিকারী হয়েছে।

স্মৃতির যুগে আদর্শ বিবাহের জন্য নারীর যে মাত্র সবর্ণেই বিবাহ হ'ত, তা নয়। তাকে গোত্র, প্রবর ও জ্ঞাতিত্ব পরিহার করতে হ'ত। স্মৃতি-পূর্ব যুগে মেয়েদের পুরুষ-ভজনা সম্বন্ধে কিন্তু সে-বিধিনিষেধ ছিল না। জ্ঞাতিত্বের কথাই আমরা প্রথম ধরছি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের এক সূক্ত থেকে বোঝা যায় যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তার বিধবা

স্ত্রী দেবরের সঙ্গেই স্ত্রীরূপে বাস করত। সেখানে বিধবাকে বলা হচ্ছে : 'তুমি উঠে পড়, যে দেবৃ তোমার হাত ধরেছে, তুমি তার স্ত্রী হয়েই তার সঙ্গে বসবাস কর।' অথর্ববেদের একজায়গাতেও ঠিক অনুরূপ কথা ধ্বনিত হয়েছে। এককথায়, ঋগ্বেদের যুগে দেবর-ভজনার রীতি প্রচলিত ছিল। বস্তুত ভাবীর সঙ্গে দেবরের যে যৌন-ঘনিষ্ঠতা (**leviration**) থাকত, তা ঋগ্বেদের বিবাহ-সম্পর্কিত সূক্তও ইঙ্গিত করে। উক্ত সূক্তে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন নববধূকে দেবৃর প্রিয়া ও অনুরাগের পাত্রী করে তোলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অপর একস্থানেও বর্ণিত হয়েছে যে, বিধবা ভাবী দেবৃকে তাঁর দাম্পত্যশয্যায় নিয়ে যাচ্ছে। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ, এই দুই গ্রন্থেই স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 'দেবৃ' বা 'দেবর' বলা হয়েছে। এই শব্দদ্বয় থেকেও ভাবীর সঙ্গে দেবরের এইরূপ সম্পর্ক সূচিত হয়। কেননা, 'দেবর' মানে দ্বি-বর বা দ্বিতীয় বর। এককথায়, মেয়েদের দেবরকে ভজনা করা সে-যুগের রীতি ছিল।

এই সম্পর্কে স্বভাবতই আমাদের পরবর্তীকালের 'নিয়োগ-প্রথা'র কথা মনে পড়ে। কিন্তু নিয়োগ-প্রথাটা ছিল স্বতন্ত্র প্রথা। বৈদিক যুগে ভাবীর ওপর দেবরের যে যৌন-অধিকার থাকত, তা সাধারণ ও সর্বকালীন রমণের অধিকার। আর পরবর্তীকালের নিয়োগ-প্রথা ছিল মাত্র সন্তান-উৎপাদনের অধিকার। সন্তান-উৎপাদনের পর এ অধিকার আর থাকত না। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, বিধবা ভাবীর ওপর দেবরের এই যৌন অধিকার অবিকৃত থাকার দরুন ঋগ্বেদে বিধবা-বিবাহের কোনো উল্লেখ নেই, যা পরবর্তীকালের গ্রন্থ-সমূহে দেখতে পাওয়া যায়। বেদে ব্যবহৃত জ্ঞাতিবাচক কয়েকটি শব্দ থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকত।

তবে নিয়োগ-প্রথায় অ-সীমিত রমণ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে নারীর যে একটা অধিকার ছিল, তা পাণ্ডুর নিকট কুন্তীর নিবেদন

থেকে আমরা বুঝতে পারি। বহুবার এরূপ রমণে প্রবৃত্ত হতে কুন্তী অস্বীকৃত হয়েছিল।

২২২

বর্তমানে উত্তর-ভারতের হিন্দুসমাজে বিবাহ কখনও নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে হয় না। সেখানে বিবাহ গোত্র-প্রবর বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া উত্তর-ভারতে সপিণ্ডদের মধ্যেও কখনও বিবাহ হয় না। দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুসমাজে কিন্তু তা নয়। সেখানে মামা-ভাগনী ও মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ হচ্ছে বাঞ্ছনীয় বিবাহ। আবার ওড়িশার হিন্দুসমাজে কোনো কোনো জাতির মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে দেবর কর্তৃক স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

হিন্দুসমাজের মতো আদিবাসী সমাজেও নিজ টোটেম-গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসী সমাজভুক্ত লাখের, বাগনী ও ডাফলা জাতির লোকেরা বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করে। আবার গারো জাতির লোকেরা বিধবা শাশুড়ীকে বিবাহ করে। ওড়িশার আদিবাসী সমাজে শবর জাতির লোকেরা বিধবা খুড়ীকে বিবাহ করে।

সুতরাং মেয়েরা যে কাকে ভজবে—দেবরকে, না জামাতাকে, না সপত্নী-পুত্রকে, না দেবর-পুত্রকে, না পিসতুতো ভাইকে, না মামাকে—সে-সম্বন্ধে সমাজ যা বিধান দেয়, তাদের তাই মানতে হয়। তবে বৌদ্ধ-সাহিত্য থেকে প্রকাশ পায় যে উত্তর-ভারতে একসময় তারা নিজ সহোদর ভাইকেই ভজনা করত। বৌদ্ধসাহিত্যের (সুত্তনিপাত) এক-জায়গায় আমরা পাই, রাজা ওক্ককের (ইক্ষ্বাকুর) প্রধানা মহিষীর পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ওই প্রধানা মহিষীর মৃত্যুর পর রাজা এক যুবতীকে বিবাহ করেন। এই রানীর যখন এক পুত্র হয় তখন সে বলে যে, তার ছেলেকেই রাজা করতে হবে। রাজা তাঁর প্রথম মহিষীর পাঁচ পুত্র ও চার মেয়েকে হিমালয়ের পাদদেশে নির্বাসিত

করেন। সেখানে কপিলমুনির সঙ্গে তাদের দেখা হয়। কপিলমুনি তাদের সেখানে একটি নগর স্থাপন করে বসবাস করতে বলেন। এই নগরের নামই কপিলাবস্তু। ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অকৃতদার থাকে। আর অপর চার ভাই চার বোনকে বিবাহ করে। এ কাহিনীটি 'মহাবস্তু'তেও আছে।

বৌদ্ধসাহিত্যের অপর এক কাহিনী অনুযায়ী (অত্থসূত্ত ও কুণাল-জাতক) অনুযায়ী শাক্যরা ছিল পাঁচ বোন ও চার ভাই। এই কাহিনী অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ ভগিনীকে তারা মাতৃরূপে বরণ করে, আর চার ভাই চার বোনকে বিবাহ করে।

বৌদ্ধসাহিত্যের (বুদ্ধঘোষের 'পরমজোতিকা', 'ক্ষুদ্দকপথ') আর-এক কাহিনী অনুযায়ী বারাণসীর রাজার প্রধানা মহিষী একখণ্ড মাংস-পিণ্ড প্রসব করেন। তিনি ওই মাংসপিণ্ডটিকে একটি পেটিকায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। ওটা যখন ভেসে যাচ্ছিল তখন একজন মুনি ওটাকে তুলে সংরক্ষণ করেন। পরে ওই মাংসপিণ্ড থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে উৎপন্ন হয়। তাদের নাম লিচ্ছবী দেওয়া হয়। এদের দুজনের মধ্যে বিবাহ হয় এবং ওরা বৈশালী রাজ্য স্থাপন করে।

এখানে উল্লেখনীয় যে, অথর্ববেদে পিতা-পুত্রী ও ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে যৌনমিলনের উল্লেখ আছে। পৌরাণিক এক কাহিনী থেকে আমরা জানি যে, নহুষ তার 'পিতৃকন্যা' বিরজাকে বিবাহ করেছিল ও তার গর্ভে ছয়টি সন্তান উৎপাদন করেছিল। বর্তমানকালে এরূপ যৌনাচারকে 'ইনসেস্ট' (incest) বা অজাচার বলা হয়। তবে যে-সমাজের মধ্যে এরূপ সংসর্গ ঘটে, সেই সমাজের নীতিবিধানের ওপরেই নির্ভর করে—কোন্‌টা অজাচার, আর কোন্‌টা অজাচার নয়।

অজাচারের সামিল হচ্ছে ব্যভিচার। নারী যখন নিজ স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেরূপ সংসর্গকে ব্যভিচার বলা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে, যতরকম ব্যভি-

চার আছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও কদর্য হচ্ছে গুরুতল্প বা গুরুস্ত্রীগমন। অথচ প্রাচীন ভারতে এটা আকছার ঘটত। গুরুর অনুপস্থিতিতে গুরুপত্নীরা পুত্রস্থানীয় ও ব্রহ্মচর্যে রত শিষ্যদের প্রলুব্ধ করত তাদের সঙ্গে যৌনমিলনে রত হতে। এ-সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদরা কী বলবেন জানি না, তবে ষাট বৎসর পূর্বে বিলাতের এক পত্রিকায় একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীকে বলতে দেখেছিলাম : **'I can think nothing more horrible than a woman proposing to a man'.** কিন্তু বাস্তব জীবনে এরূপ **horrible** জিনিসই ঘটে। শিষ্যদের কাছে গুরুপত্নীদের যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা তারই উদাহরণ। ঋগ্বেদেও আমরা পড়ি, যমী তার সহোদর ভ্রাতা যমকে প্রলুব্ধ করছে তার সঙ্গে যৌনমিলনে রত হবার জন্য।

নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখনই—যখন সে নিজ স্বামীকে ভজনা করতে চায় না, বা তার নিজ স্বামী স্থানান্তরে থাকে। শেষোক্ত পরিস্থিতিটাই গুরুতল্পের ক্ষেত্রে খাটত। আদিম যৌনক্ষুধার প্রক্রিয়াতেই এটা ঘটে। এটা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল মধ্যযুগে, আমাদের দেশের কৌলীন্য-শাসিত সমাজে। সে-সমাজের মেয়েরা বিবাহের পর বাপের বাড়িতেই থেকে যেত। স্বামী ক্বচিৎ-কদাচিৎ শ্বশুরবাড়ি আসত। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি এলে কি হবে ? বিনা দক্ষিণায় তারা কখনও স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হ'ত না। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল'-এ এর এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে এক কুলীনের মেয়ের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন :

'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই॥

বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্বিয়া হবে কিনা বিয়া হবে আগে॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ঘাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥
দু-চারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥
সূতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ, নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥"

এরূপ সমাজে যে-সব মেয়ের যৌনক্ষুধা প্রবল, তাদের ক্ষেত্রে যা ঘটত তা সহজেই অনুমেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেটা খোলাখুলিই বলেছিলেন। রামনারায়ণ তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে পিতা-পুত্রের সংলাপের ভেতর দিয়ে সেটা বলেছেন। পুত্র তিন বৎসর শ্বশুরবাড়ি যায়নি। হঠাৎ খবর এল তার একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। পুত্র আশ্চর্য হয়ে পিতাকে যখন এ-কথা বলছে, তখন পিতা বলছেন, 'বাপু হে! তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করে তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সাক্ষাৎ হয়।' কুলীনকন্যাদের যখন স্বামী ব্যতীতই গর্ভ হ'ত, তখন মেয়ের মায়েরা কী কৌশল অবলম্বন করে সেই সন্তানের বৈধতা পাড়াপড়শীর কাছে জানাত তা বিদ্যাসাগরমশাই তাঁর 'বহুবিবাহ' নিবন্ধে বিবৃত করেছেন।

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রে কুমারী মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করাটা একটা গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যদি কোনো পুরুষ অনূঢ়া মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

আরও বলা হয়েছে যে, রাজা সংশ্লিষ্টা কুমারীকে সমস্ত কলঙ্ক থেকে মুক্ত করবেন এবং তাকে তার অভিভাবকদের হাতে সমর্পণ করবেন, যদি অভিভাবক যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত নিষ্পাদনের ব্যবস্থা করে।

কিন্তু দেখা যায়, মহাভারতীয় যুগে কুমারী মেয়েদের যৌনসংসর্গ অনুমোদিত হ'ত। বোধহয় তার আগের যুগেও হ'ত। কেননা, ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখতে পাই, মহর্ষি সত্যকামের মাতা জবালা যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। মহাভারতে এরূপ সংসর্গের একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। পরাশর-সত্যবতীর কাহিনী সুবিদিত। সত্যবতী যৌবনে যমুনায় খেয়া-পারাপারের কাজে নিযুক্ত থাকত। একদিন পরাশরমুনি তার নৌকোয় উঠে, তার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে যৌন-মিলন প্রার্থনা করে। সত্যবতী তখন পরাশরকে বলে—'নৌকোর মধ্যে আমি কী ভাবে যৌনকর্মে রত হব, কেননা তীর হতে লোকেরা আমাদের দেখতে পাবে।' পরাশর তখন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেন ও তারই অন্তরালে তার সঙ্গে যৌনমিলনে রত হন। এর ফলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম হয়। কুন্তীও কুমারী অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে মিলনের ফলে কর্ণকে প্রসব করেন। মাধবী-গালব উপাখ্যানেও আমরা দেখি যে, প্রতিবার সন্তান-প্রসবের পরও মাধবী কুমারী ছিল। ওই যুগের সমাজে বিবাহের পূর্বে যে মেয়েদের যৌনসংসর্গ অনুমোদিত হ'ত এবং এরূপ যৌনসংসর্গের জন্য মেয়েরা তাদের কুমারীত্ব হারাত না, তা কুমারী মেয়েদের সন্তানদের বিশিষ্ট আখ্যা থেকে বুঝতে পারা যায়। এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণ কর্ণকে বলেছেন, 'কুমারী মেয়ের দু'রকম সন্তান হতে পারে—(১) কানীন ও (২) সহোঢ়।' যে সন্তানকে কন্যা বিবাহের পূর্বেই প্রসব করে, তাকে বলা হয় 'কানীন'। আর যে মেয়ে বিবাহের পূর্বে গর্ভধারণ ক'রে বিবাহের পরে সন্তান প্রসব করে, সে-সন্তানকে বলা হয় 'সহোঢ়'। মহাভারতের অপর একজায়গায় ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, 'কুমারী মেয়ের দু'রকমের সন্তান হতে পারে। যে সন্তানকে সে বিবাহের পূর্বে

প্রসব করে, তাকে বলা হয় কানীন, আর যে সন্তানকে সে বিবাহের পরে প্রসব করে, তাকে বলা হয় অরোঢ়।' এসব থেকে বুঝতে পারা যায় যে, মহাভারতীয় যুগে কুমারী কন্যার পক্ষে গর্ভধারণ করা বিশেষ নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না।

ꕥ ꕥ ꕥ

এ-সম্পর্কে পরবর্তীকালের মুঘল-অন্তঃপুরের একটা রীতি উল্লেখের দাবি রাখে। মুঘল বাদশাহগণের মেয়েরা (বাদশাজাদীরা) সাধারণত পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'ত না। তারা আজীবন অবিবাহিতা থেকে বিবাহিত জীবনের দৈহিক সুখ গোপনে উপভোগ করত। কথিত আছে, সম্রাট আকবর নাকি এই ঘৃণিত প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। মনে হয়, বাদশাজাদীর স্বামী ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ করতে পারে এবং অসীম শক্তিশালিনী বাদশাজাদী স্বামীর স্বার্থের জন্য ভ্রাতা বা পিতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে, এই আশঙ্কায় মুঘল সম্রাটগণ তাঁদের মেয়েদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতেন না।

ꕥ ꕥ ꕥ

আদিবাসী সমাজে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনাচার অনুমোদিত। যৌথ ঘুমঘরগুলিতে ছেলেমেয়েরা একত্রে রাত্রিযাপন করে। এগুলি তরুণ-তরুণীদের যৌনচর্চায় দক্ষতা অর্জনের সংস্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডদের মধ্যে প্রচলিত ঘুমঘরগুলিকে 'ঘোটুল' বলা হয়। মুণ্ডা ও বিরহোড়রা এগুলিকে 'গিতিওড়া' বলে। আসামের গারো জাতিরা এগুলিকে 'লোকপাণ্ডে' বলে। নাগাদের মধ্যে এগুলিকে বলা হয় 'মোরাং'। যৌথ ঘুমঘরগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে মুরিয়াদের ভেতর প্রচলিত ঘোটুল। মুরিয়াদের মধ্যে বিদ্যমান ঘোটুল পূর্ণবিকশিত ঘুমঘরের প্রতীক। ঘোটুলের ভিতরটায় নানারকম চিত্র অঙ্কিত ও

খোদিত থাকে। অনেকস্থলেই এসকল চিত্র যৌন-অর্থব্যঞ্জক। কোনো কোনো ঘোটুলে প্রকাণ্ড আকারের পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট এক তরুণ একটি তরুণীকে আলিঙ্গন করে ধরে আছে—এরূপ চিত্রও অঙ্কিত থাকে। ঘোটুলের মধ্যে যৌনজীবন অনুসৃত হলেও, প্রকৃত বিবাহের বয়স এলে তাদের অপরের সঙ্গে নিয়মানুগ বিবাহ করতে হয়। ঘোটুলের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কী সুন্দরী কী কুৎসিতা—সকল মেয়েই যৌন-চর্চায় সমান অধিকার পায়। তবে তরুণ-তরুণীদের একই জুড়িদারের সঙ্গে তিনদিনের বেশি শুতে দেওয়া হয় না। (ঘোটুলের যৌনচর্চার পূর্ণ বিবরণের জন্য লেখকের 'ভারতে বিবাহের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য)। ঘোটুল ছেলেমেয়েদের যৌনাচার অনুশীলনের একটা মাধ্যম-বিশেষ। এরূপ যৌনাচারের মধ্যে মেয়েদের পুরুষের আধিপত্য মেনে নেবার, বা পুরুষের মেয়েদের ওপর আধিপত্য প্রকাশের কোনো অবকাশই থাকে না। কেননা, সকল ছেলেমেয়েরই যৌনাচারে সমান অধিকার থাকে। তাছাড়া, এসব যৌনাচার শাশ্বত নয়। ঘোটুলের জীবন শেষ হলে মেয়েরা অন্য পুরুষকে বিবাহ করে এবং তার সঙ্গে সুখেই ঘর করে। ঘোটুল-জীবনের জুড়িদারের কোনো প্রভাব তাদের মনের ওপর ছাপ ফেলে না।

পুরুষের আধিপত্য না মেনে মেয়েরা যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারে দু'-রকমে। এক হচ্ছে 'সামান্যা' বা বারাঙ্গনার জীবন যাপন করে। আর-একরকম হচ্ছে পুরুষ-ব্যতিরেকে বিকল্প উপায়ে। কিন্তু সমাজের স্বাস্থ্য ও সংহতির দিক থেকে এ-দুটোর কোনোটাই কাম্য নয়। সামান্যা বা বারাঙ্গনাদের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন বাৎস্যায়ন তাঁর 'কাম-সূত্রে'। বাৎস্যায়ন বারাঙ্গনাদের ছয় শ্রেণীতে ভাগ করেছেন; যথা—(১) পরিচারিকা, (২) কুলটা, (৩) স্বৈরিণী, (৪) নটী, (৫) শিল্প-কারিকা ও (৬) প্রকাশবিনষ্টা। এদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য

আছে। কোনো বারাঙ্গনা-দুহিতা বিবাহিতা হয়ে যদি একবৎসর নিজ পতির কাছে 'সতী' হয়ে থাকে, এবং তারপর নিজের ইচ্ছেমত যৌনাচারে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু প্রাক্তন স্বামী এলে তার সঙ্গে একরাত্রি বাস করে তার পরিচর্যায় রত হয়, তবে সেরূপ নারীকে 'পরিচারিকা' বলা হয়। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে 'পরিচারিকা'র অবশ্য অন্য সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যে নারী স্বামীর ভয়ে অপরের গৃহে গিয়ে অপর পুরুষের সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত হয়, তাকে 'কুলটা' বলা হয়। যে নারী নিজ স্বামীকে গ্রাহ্য না করে নিজ গৃহে বা অন্য গৃহে অপর পুরুষের সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত হয়, তাকে 'স্বৈরিণী' বলা হয়। যে নারী নাচগান করে, অথচ বেশ্যাবৃত্তিও করে, তাকে 'নটী' বলা হয়। রজক, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীর ভার্যা যখন পতির অনুমতি নিয়ে বিত্তবান লোকের সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত হয়, তাকে 'শিল্পকারিকা' বলা হয়। যে নারী স্বামী জীবিত থাকাকালীন বা তার মৃত্যুর পর প্রকাশ্যে অপরের সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত হয়, তাকে 'প্রকাশবিনষ্টা' বলা হয়।

বর্তমানকালে আমরা তাদেরই বারাঙ্গনা বলি, যারা অর্থপ্রাপ্তির আশায় অপর পুরুষগণের সঙ্গে কামাচারে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ বারাঙ্গনা অবশ্য আমাদের দেশে ঋগ্বেদের আমল থেকেই ছিল। 'সমন' উৎসবে তাদের উপস্থিতির কথা আমি আগেই বলেছি। বাজসনেয়ী সংহিতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তখন গণিকাবৃত্তি প্রচলিত ছিল। রামায়ণেও আমরা পাই, গণিকাদের নিযুক্ত করেই বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনা হয়েছিল। মহাভারতে আমরা দেখি যে, রণক্ষেত্রে সৈনিকগণের মনোরঞ্জনের জন্য গণিকাদের শিবির স্থাপন করা হ'ত। বৌদ্ধসাহিত্য থেকেও আমরা গণিকাবৃত্তি প্রচলনের কথা জানতে পারি। অম্বপালী, পদুমাবতী, সালবতী, সিরিমা, বিমলা, অর্ধকাশী প্রভৃতি গণিকাদের কথা আমরা বৌদ্ধসাহিত্যে পাই। একমাত্র আদিবাসী সমাজেই গণিকা অনুপস্থিত।

পুরুষের আধিপত্য অস্বীকার করে মেয়েরা অবশ্য স্বাধীনভাবে সামাজ্যার জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু সেটা তো সামাজিক সংহতি ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে কাম্য নয়। তাছাড়া, সৃষ্টি বজায় রাখতে হলে স্ত্রী ও পুরুষকে পরস্পরের সংলগ্ন থাকতেই হয়।

ꕥ ꕥ ꕥ

পুরুষের আধিপত্য মানা তো দূরের কথা, বিনা-পুরুষেই নারী যেভাবে তার যৌনাচারের অনুশীলন করতে পারে, তা হচ্ছে হস্তমৈথুন (**masturbation**) ও সমরতি-কামনা (**lesbianism**)। এ-দুটোই হচ্ছে পুরুষবিমুখী অভ্যাস। হস্তমৈথুন হচ্ছে যোনিগহ্বরকে অঙ্গুলি-সঞ্চালন দ্বারা উত্তেজিত করে যৌনসুখ উৎপাদন করা। আর সমরতি-কামনা হচ্ছে এক নারীর অপর নারীর সহিত প্রণয়ীর সম্পর্ক স্থাপন করে কামাসক্ত হওয়া। হস্তমৈথুন যে নারীসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে, তা আমরা হ্যাভলক এলিস, ফ্রয়েড, ক্যাথারিন ডেভিস, এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার স্টেকেল ও মল (**Moll**)-এর গ্রন্থসমূহ থেকে জানতে পারি। বর্তমান শতাব্দীর শেষার্ধে এ-সম্বন্ধে বিশেষ সমীক্ষা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কিনসে (**Alfred Kinsey**)। এই সমীক্ষা মেয়েদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে করা হয়েছে। বিভিন্ন বয়স-পর্যায়ে শতকরা কতজন মেয়ে ও পুরুষ হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয়, তা কিনসের রিপোর্টের ভিত্তিতে দেওয়া হল :

(১) বিশ বছর বয়সের মধ্যে—

পুরুষ ৯০ শতাংশ।

মেয়ে ৩০ শতাংশ।

(২) চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে—

পুরুষ ৯৫ শতাংশ।

মেয়ে ৮০ শতাংশ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ২০—৪০ বছর বয়সের মধ্যেই মেয়েদের মধ্যে হস্তমৈথুন প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্‌সের রিপোর্ট থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে, কুমারী মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা খুবই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ; তবে বিবাহিত মেয়েরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয়। কিন্‌সের রিপোর্টের এক অংশে পড়ি এবং সেটাই বোধহয় বিবাহিত মেয়েদের হস্তমৈথুনে লিপ্ত হবার কারণ। কিন্‌সে বলেছেন, 'For perhaps three-quarters of all males, orgasm is reached within three minutes after the initiation of the sexual relation···Considering many upper level females who are adversely conditioned to sexual situations that they may require ten to fifteen minutes of the most careful stimulation to bring them to climax, and considering the fair number of females who never come to climax in their whole lives, it is, of course, demanding that the male be quite abnormal in his ability to prolong sexual activity without ejaculation if he is required to match the female partner.'

এ সম্পর্কে D. H. Lawrence-এর উক্তি—'Woman should not experience the orgasm' একটা অবাস্তব উক্তি।

একজন অস্তিবাদী (existentialist) লেখিকা যিনি মেয়েদের যৌনজীবন সম্বন্ধে অনুশীলন করেছেন, তিনি হচ্ছেন সিমোন দ্য বভোয়ার। তিনিও বলেছেন, 'It is certainly true that woman's sex pleasure is quite different from man's.' এজন্য গণিকারাও হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত হয়।

সমরতি-কামনায় (lesbianism) পুরুষকে পরিহার করে দুই

নারী পরস্পর প্রেমাবদ্ধ হয়ে হস্তমৈথুন বা অন্য কোনো উপায়ে নিজেদের কামাচার থেকে যৌনসুখ উপলব্ধি করে। সিমোন দ্য বভোয়ার বলেছেন, 'The lesbian in fact, is distinguished by her refusal of the male and her liking for feminine flesh ; but every adolescent female fears penetration and masculine domination, and she feels a certain repulsion for the male body ; on the other hand, the female body is for her, the male, an object of desire.'

আবার এ-সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Harold Roses বলেছেন, 'As sexual modes have changed, increasing number of lesbian women have proclaimed the right to live their homosexual lives openly.'

কিন্তু এরূপ মনোবৃত্তি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। পুরুষের সংলগ্ন হয়ে থাকাই মেয়েদের স্বাভাবিক ধর্ম। এর জন্য তাদের যে মাত্র পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করতে হয়, তা নয়। অনেকসময় তারা পুরুষের হাতে দৈহিক পীড়নের জন্যও নিজেদের সমর্পণ করে। দৈহিক পীড়ন (masochism) থেকেই তাদের যৌনসুখ হয়। এ-সম্বন্ধে Havelock Ellis তাঁর 'Psychology of Sex' গ্রন্থে বলেছেন, 'That the infliction of pain is a sign of love is widespread idea both in ancient and modern times. Lucian makes a woman say : He who has not rained blows on his mistress and torn her hair and her garments is not yet in love.'

Cervantes-ও তাঁর এক নভেলে এক নায়িকার মুখ দিয়ে

বলিয়েছেন, 'He does not know how to make me suffer a little. One cannot love a man who does not make one suffer a little.'

আবার Congreve-এর 'Way of Life'-এ Millament বলেছে : 'One's cruelty is one's power.' রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এও এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বলছে, 'মারো আমাকে অস্ত্র নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কিছু হতে পারে না।' বস্তুত মেয়েরা স্বেচ্ছাতেই পুরুষের আধিপত্য মেনে নেয়, এবং তার জন্য মারধোর খাওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকে। তবে পুরুষের দিক থেকে নিজের আধিপত্য তুলে ধরবার যে প্রয়াস নেই, তা বলছি না। বস্তুত অনেক স্থলেই মেয়ে ও পুরুষ পরস্পারের আধিপত্য তুলে ধরবার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে প্রকাশ পায় দ্বন্দ্ব, সঙ্ঘর্ষ ও মারধোর। এই তো আমার বাড়ির পাশের ফ্ল্যাট থেকেই শুনতে পাই। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই শিক্ষিত ও দুজনেই স্বাবলম্বী। স্বামী অফিস থেকে আগে ফিরে এসেছে। স্ত্রী শেষে ফিরে স্বামীকে তিরস্কার করে বলে—'অফিস থেকে আগে ফিরেছো, চায়ের জলটা তো স্টোভে চাপিয়ে দিতে হয়, সেটাও পার না ?' এই নিয়ে দুজনে বচসা, তারপর ধস্তাধস্তি। স্ত্রী পাড়ার লোকের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে, 'আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান।' তারপর সবই নীরব। এতে তাদের দাম্পত্য-জীবনের সুখ ব্যাহত হয় না। আমার এক বন্ধুর মা বলতেন : বিবাহের পর প্রথম বৎসর স্ত্রী তার স্বামীর কথা শোনে, দ্বিতীয় বৎসরে স্বামী তার স্ত্রীর কথা শোনে, আর তৃতীয় বৎসরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কথা পাড়ার লোক শোনে।

এসব থেকে মনে হয় যে, মেয়েরা পুরুষের আধিপত্যটা দাম্পত্য-জীবনের আনুষঙ্গিক ব্যাপার হিসাবেই গ্রহণ করে। আমি আবার সেই ভৈরব ও দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথাতেই ফিরে আসছি।

নারীর দুটি ভাব—নারী কামিনী ও জননী। মানুষের পারিবারিক জীবনে এ-দুটি ভাবই গঙ্গা-যমুনার মতো সম্মিলিত ধারাতে প্রবাহিত। কামিনী হিসাবে নারীর আছে যৌনক্ষুধা। সেটার নিবৃত্তি করতে গিয়েই সে সন্তানবতী হয়। তখনই তার জননীরূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু জননীরূপে সন্তানকে প্রতিপালন করতে হলে পুরুষকে তার দরকার হয়। সুতরাং পুরুষের আধিপত্য তাকে মানতেই হয়। এককথায় পুরুষ তার মাত্র প্রণয়ী নয়, পুরুষ তার সন্তানের জনক ও পালক, পুরুষ তার হাতিয়ার-বিশেষ।

জননী-ভাবটা যদি ছেড়েই দিই, কামিনী হিসাবে তার আদিম যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পুরুষ তার কাছে অপরিহার্য। সেজন্যই আমরা প্রথম বিদ্রোহী নারী সাঁদ (George Sand)-কে দেখি বারবার পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করতে। বিংশ শতাব্দীতেও আমরা দেখেছি অস্তিবাদী লেখিকা সিমোন দ্য বভোয়ার (যিনি নারীজীবন সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি অনুশীলন করেছেন) কুমারী হয়েও আত্মসমর্পণ করেছেন পল দ্য সারতার (Paul de Sartre) কাছে। এ সম্পর্কে মনে পড়ে যায় শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীকে। কিন্তু শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে যে সম্পর্ক চিত্রিত করেছেন, সে সম্পর্কটা সম্পূর্ণ অবাস্তব সম্পর্ক। এটা Platonic love-এর সম্পর্ক। বাস্তব জীবনে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এরকম Platonic love-এর সম্পর্ক একেবারেই বিরল। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চার অধ্যায়'-এ একেবারেই বাস্তব। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব ও জৈব সত্যের বাসরঘরে শেষ চুম্বন দিয়েই তাঁর কাহিনী শেষ করেছেন।

সারা পৃথিবীতে যদিও নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান,

তা সত্ত্বেও নারী যে পুরুষের সমান নয়—অসমান, সে বিষয়ে সে খুবই সচেতন। শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধূলা, পেশা ও কর্মনিযুক্ততায় নারী অনেক-দূর এগিয়ে গেলেও সে তার জৈব জীবনে স্বাবলম্বী নয়। জৈব জীবনে নারী তখনই স্বাবলম্বী হয়, যখন সে পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকে। এজন্যই মধ্যযুগের নারী তার আর্তি প্রকাশ করেছিল এক গীতের মাধ্যমে। করুণ কণ্ঠে সে গেয়ে উঠেছিল—'ওপার হতে বাজাও বাঁশী, এপার হতে শুনি। / অভাগিয়া নারী আমি, সাঁতার নাহি জানি॥'

পুরুষকে না পেয়ে সে নিজেকে অভাগী বলেই মনে করেছিল।

ꕥ ꕥ ꕥ

এটা নারীর দুর্বলতা হোক বা আদিম অভিশাপই হোক, নারী শিক্ষিতাই হোক বা অশিক্ষিতাই হোক, সে চায় পুরুষের সান্নিধ্য ; তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকুক না কেন পুরুষের আধিপত্য। অশিক্ষিতা নারীদের কথা ছেড়েই দিলাম ; শিক্ষিতা নারীদের প্রবণতা এ-সম্পর্কে সবাক সাক্ষ্য বহন করে। খবরের কাগজে 'পাত্র-পাত্রী চাই' স্তম্ভটা দেখলেই এটা বুঝতে পারা যায়। আমার সামনে যে কাগজখানা পড়ে রয়েছে, সেখানা খুলে দেখি শিক্ষিতা মেয়েদের জন্য পাত্রের সন্ধান অসংখ্য। গুনে দেখি মাত্র একদিনের কাগজেই রয়েছে ১৫৩টা বিজ্ঞাপন। যাদের জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে, তারা এম. এ , বি. টি. থেকে স্নাতক ও ফার্স্ট-ক্লাস স্নাতক অনার্স। একজন আছে বি. কম., ম্যানেজমেণ্ট ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত মেয়ে। তিনজন লাইব্রেরিয়ান ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত। একজন ডাক্তার। বয়স ১৯ থেকে ৩৭। অধিকাংশ বিজ্ঞাপনেই বলা হয়েছে যে, পাত্রী ফর্সা ও সুশ্রী। ১৫৩ জনের মধ্যে ৬৫ জন চাকরিতে রত। কেউ অধ্যাপিকা, কেউ কেন্দ্রীয় সংস্থায় চাকরি করে, কেউ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের স্টেনোগ্রাফার, আবার কেউ-বা শিক্ষিকা। দু-একজন আইনজ্ঞও আছে। কেউ কেউ অসবর্ণ বিবাহ

করতেও রাজি। এককথায় সকলেই শিক্ষিতা ও আধুনিক স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতীক। কিন্তু সকলেই বিবাহিতা হবার জন্য লালায়িত। সকলেই পুরুষের সঙ্গিনী হতে চায়, যদিও জানে এর মানে পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করা। এটা যে নিছক পাগলামি নয়, তা সকলেই স্বীকার করবেন। পুরুষ-ভজনার জন্য কেন এই প্রবণতা ? তার কারণ আর কিছুই নয়, নারী কামিনী ও জননী। কামিনী হিসাবে আছে তার আদিম যৌনক্ষুধা, আর জননী হিসাবে আছে তার মাতৃত্বের গর্ব। মাতৃত্বের গর্ব যে কত গভীর, তা উনিশ শতকের ঔপন্যাসিক মিসেস উড-এর 'ইস্ট লীন' উপন্যাসখানা পড়লেই বুঝতে পারা যায়। মাতৃত্বের গর্বই হচ্ছে 'প্রমীলা কেন পুরুষ ভজে ?'—প্রশ্নের উত্তর। তবে বৈধতার সঙ্গে প্রমীলা কাকে ভজবে, সেটা নির্ভর করে সামাজিক রীতিনীতি ও বিধানের ওপর।

দেবলোকে প্রমীলা

মাত্র ইহলোকেই যে প্রমীলা পুরুষ ভজে, তা নয়। দেবলোকেও সে ঘরকন্না করে পুরুষ দেবতাদের সঙ্গে, দেবলোকের অন্তঃপুরে। মানুষ তার দেবতাদের নিজ প্রতিরূপেই কল্পনা করে নিয়েছিল। সেজন্য আমরা মনুষ্যলোকের অন্তঃপুরের সঙ্গে দেবতাদের অন্তঃপুরের কোনো প্রভেদ দেখি না। মনুষ্যলোকের অন্তঃপুরে যেমন একদিকে দেখা যায় পাতিব্রত্য ও অপরদিকে ব্যভিচার, দেবলোকের অন্তঃপুরেও তেমনই একদিকে দেখা যায় পতিভক্তির চরম নিদর্শন ও অপরদিকে ব্যভিচারী স্বামী ও স্ত্রী। মনুষ্যলোকে যেমন সাধ্বী স্ত্রী বিব্রত হয় সুরাপায়ী স্বামীকে নিয়ে এবং ব্যাধি ও মহামারীর প্রকোপে, দেবলোকেও তাই।

ইন্দ্রকে বলা হ'ত দেবরাজ। সেজন্য ইন্দ্রের অন্দরমহলই ছিল আদর্শ অন্দরমহল। ইন্দ্রের অন্দরমহলে বাস করত ইন্দ্রের স্ত্রী ও সন্তান। বোধহয় ইন্দ্রের পিতাও ওই একই সংসারে থাকত।

ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী নামে পরিচিত। ইন্দ্রের স্ত্রী বলেই তাকে ইন্দ্রাণী বলা হ'ত। তা না হলে, তার আসল নাম ছিল শচী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অনুযায়ী ইন্দ্র যৌন আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে অন্য সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে আছে যে, ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর সতীত্ব নষ্ট করে ও তার পিতা পুলোমাকে হত্যা করে ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করেছিল।

প্রজাপতির ন্যায় ইন্দ্র স্বয়ম্ভু দেবতা নয়। ত্বষ্টা তার পিতা, অদিতি তার মাতা। স্বাভাবিকভাবে মায়ের গর্ভদ্বার দিয়ে ইন্দ্র নির্গত হয়নি। ইন্দ্র মায়ের পেট বিদীর্ণ করে পেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

ইন্দ্রের মতো স্বামীকে নিয়ে ঘর করায় শচীর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। শুধু তাই নয়, দেবলোকের অন্য মেয়েদের মতো শচীর চরিত্র কলঙ্কিত ছিল না। শচী ছিল পতিপরায়ণা স্ত্রী, যদিও অন্দরমহলে শচীর স্বস্তি ছিল

না। স্বামী ছিল সুরাপায়ী ও ব্যভিচারী। দেবতাদের সুরা ছিল সোমরস, যা মনুষ্যলোকেও ঋষিরা ও মানুষেরা পান করত। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে ইন্দ্র এত সোমরস পান করত যে, তার উদর ছিল সোমরসের হ্রদ। অত্যধিক সোমরস পানের ফলে তার উদর সবসময় স্ফীত হয়ে থাকত। সুরাপায়ী দেবতা হলেও, যৌনজীবনে ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর প্রতি অমনোযোগী ছিল না। এর কারণ মনে হয় ইন্দ্রাণী এক বিশেষ রকম রমণ-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞা ছিল। এটা আমরা জানতে পারি বাৎস্যায়নের কামসূত্র থেকে। নাগরিক সমাজের লোকেরা কিভাবে তাদের যৌনজীবনকে সুখময় করে তুলত, তার পরিচয় দিতে গিয়ে, বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্র'-তে মানুষ যতরকম পদ্ধতিতে (coital postures) রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হতে পারে তার এক বিবরণ দিয়েছেন। বাৎস্যায়ন এক বিশেষ রকম পদ্ধতিতে রমণের নাম দিয়েছেন 'ইন্দ্রাণিক রতি'। তিনি বলেছেন, যেহেতু ইন্দ্রাণী শচী এই বিশেষ পদ্ধতিতে রতি-ক্রিয়া করতে ভালবাসতেন, সেইহেতু এই পদ্ধতির নাম 'ইন্দ্রাণিক রতি'। পদ্ধতি যাই হোক, ইন্দ্রের ঔরসে শচীর এক পুত্র হয়েছিল, নাম জয়ন্ত।

মনুষ্যসমাজে মানুষ যেমন ব্যাধি ও মহামারীতে বিব্রত হয়, ইন্দ্রের অন্দরমহলেও একবার তাই ঘটেছিল। ইন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়ন্ত একবার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কাহিনীটা সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন দাশু রায় তাঁর পাঁচালীতে। এই কাহিনী অনুযায়ী রাজা নহুষ একবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়ে শীতল হলে, তা থেকে এক পরমাসুন্দরী রমণী আবির্ভূতা হন। ব্রহ্মা তাঁর নাম দেন শীতলা, এবং বলেন, 'তুমি পৃথিবীতে গিয়ে বসন্তের কলাই ছড়াও। এরূপ করলে লোকে তোমার পূজা করবে।' শীতলা বললেন, 'আমি একা পৃথিবীতে গেলে লোকে আমার পূজা করবে না, আপনি আমার একজন সঙ্গী দিন।' ব্রহ্মা তাঁকে কৈলাসে শিবের কাছে

যেতে বলেন। শীতলা কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছে তাঁর প্রয়োজনের কথা বলেন। মহাদেব চিন্তিত হয়ে ঘামতে থাকেন। তাঁর ঘাম থেকে জ্বরাসুর নামে এক ভীষণাকার অসুর সৃষ্টি হয়। জ্বরাসুর শীতলার সঙ্গী হয়। কিন্তু শীতলা বলেন, 'দেবতারা যদি আমার পূজা না করেন, তাহলে পৃথিবীর লোক আমার পূজা করবে কেন?' তখন শিব তাঁকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ইন্দ্রপুরীতে যেতে বলেন। ইন্দ্রপুরীর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় জ্বরাসুরের মাথা থেকে বসন্তের কলাইয়ের ধামাটা রাস্তায় পড়ে যায়। সে-সময় ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্ত সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শীতলা তাকে ধামাটা জ্বরাসুরের মাথায় তুলে দিতে বলেন। ইন্দ্রের ছেলে এটা তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর মনে করে ব্রাহ্মণীকে ঠেলে ফেলে দেয়। শীতলার আদেশে জ্বরাসুর ইন্দ্রের ছেলেকে আক্রমণ করে। এর ফলে ইন্দ্রের ছেলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। তারপর শীতলা দেবসভায় গিয়ে ইন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন। ইন্দ্র তো চটে লাল! ভাবেন, সমস্ত জগতের লোক তাঁকে পূজা করে, আর এ কোথাকার এক বুড়ী এসে তাঁকে আশীর্বাদ করছে! এর আস্পর্ধা তো কম নয়! ইন্দ্র তাকে মেরে তাড়িয়ে দেন। তারপর ইন্দ্র নিজেও বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। অন্য দেবতারাও হন। মহামায়ার দয়া হয়। তিনি গিয়ে শিবের শরণাপন্ন হন। শিব বলেন, 'দেবতারা সকলে শীতলার পূজা করুক, তাহলে রোগমুক্ত হবে।' তখন দেবতারা ঘটা করে শীতলার পূজা করে। (সম্পূর্ণ কাহিনীটির জন্য লেখকের 'বাঙলা ও বাঙালী' গ্রন্থের ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইন্দ্র ও তার পুত্র জয়ন্ত দুজনেই যখন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তখন ইন্দ্রের অন্দরমহলে ইহলোকের স্ত্রী ও জননীদের মতো, ইন্দ্রাণীকেও বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছিল। আবার ইহলোকের মেয়েদের মতো ইন্দ্রাণীকেও শীতলাপূজার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

ইন্দ্রাণী অত্যন্ত পতিপরায়ণা রমণী ছিল। এটা আমরা জানতে

প্যারি রাজা নহুষের কাহিনী থেকে। একবার দেবতা ও মহর্ষিরা ব্রহ্মহত্যা ও মিথ্যাচারে বৃত্রাসুরকে নিহত করার জন্য ইন্দ্রকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন। তাঁরা রাজা নহুষকে ইন্দ্রের আসনে বসান। কিন্তু ইন্দ্র ছিল ব্যভিচারী দেবতা। সুতরাং আসনের দোষ যাবে কোথায়? নহুষ কামার্ত হয়ে ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে হস্তগত করবার চেষ্টা করে। শচী বিপদাপন্ন হয়ে নিজেকে নহুষের কামলালসা থেকে রক্ষা করবার জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হয়। বৃহস্পতির পরামর্শে শচী নহুষকে বলে যে, নহুষ যদি সপ্তর্ষি-বাহিত যানে তার কাছে আসে, তাহলে সে নহুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। নহুষ সপ্তর্ষি-বাহিত শিবিকায় যাবার সময় অগস্ত্যের মাথায় পা দিয়ে ফেলে। এর ফলে, অগস্ত্যের শাপে নহুষ অজগরসর্পরূপে বিশাখযূপ বনে পতিত হয়। এভাবে শচীর সতীত্ব রক্ষা পায়।

কিন্তু শচী পতিপরায়ণা হলেও, ইন্দ্র একান্তভাবে স্ত্রীপরায়ণ ছিলেন না। অন্য দেবতাদের মতো ইন্দ্র ব্যভিচারী দেবতা ছিলেন। অজাচারী হবার জন্যও তিনি একবার উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁর ব্যভিচারের সর্বজনবিদিত দৃষ্টান্ত হচ্ছে গৌতম ঋষির অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী অহল্যাতে উপগত হওয়া। অহল্যা ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও সে-সময় কামার্তা ছিল বলে দুর্মতিবশত ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গমে রত হয়েছিল। (এ সম্বন্ধে লেখকের 'বাঙলা ও বাঙালী', পৃষ্ঠা ৮৪ দেখুন)।

ইন্দ্রের অজাচারের উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের ১।৫২।১৩ সম্বন্ধে সায়ন ভাষ্যে। সে উল্লেখ অনুযায়ী ইন্দ্র একবার বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হয়েছিল। পরে ইন্দ্র ইন্দ্রত্বে ফিরে আসবার পর মেনাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখে স্বয়ং তার সঙ্গে সহবাস অভিলাষ করেছিল। কিন্তু ইন্দ্রের এসব ব্যভিচার ও অজাচারপ্রবৃত্তি নিয়ে ইন্দ্রের অন্দরমহলে শচীর সঙ্গে তার কোনদিন বাক্‌বিতণ্ডা বা কলহ ঘটেনি।

আগেই বলেছি যে, ইন্দ্রের সংসারে বোধহয় তার পিতাও বাস

করত। এটা আমরা জানতে পারি ইন্দ্রের সুরাপানের বহর থেকে। বলা হয়েছে, ইন্দ্র এমনই সুরাসক্ত ছিল যে, তার পিতার কাছ থেকেও কেড়ে নিয়ে সে সুরা পান করত।

সূক্তসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে, ইন্দ্রের পরেই অগ্নি ছিল আর্যদের দ্বিতীয় প্রধান দেবতা। অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র। আবার বলা হয়েছে, অরণিদ্বয় অগ্নির জনক-জননী। জাত হওয়া-মাত্রই অগ্নি জনক-জননীকে ভক্ষণ করেছিল। আবার মহাভারতে বলা হয়েছে যে, ধর্মের ঔরসে ও বসুভার্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম।

প্রথম উক্তি অনুযায়ী অগ্নির সংসারে তার পিতামাতার অবস্থানের প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয় উক্তি সম্বন্ধে মহাভারত নীরব। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, অগ্নির অন্দরমহলে ছিল মাত্র তার স্ত্রী স্বাহা ও তিন পুত্র —পাবক, পবমান ও শুচি।

ইন্দ্রের অন্দরমহলে শচী যেমন ছিল নিষ্কলঙ্কা রমণী, অগ্নির সংসারে স্বাহা ছিল তেমনই অপবিত্রা। স্বাহা ছিল দক্ষের মেয়ে। বিয়ের আগেই স্বাহা অত্যন্ত কামাসক্তা ছিল। একবার সপ্তর্ষিদের যজ্ঞে অগ্নি সপ্তর্ষি-দের স্ত্রীদের দেখে কামার্ত হয়ে ওঠে। স্বাহা এটা লক্ষ্য করে। স্বাহা তখন এক-এক ঋষিপত্নীর রূপ ধরে ছয়বার অগ্নির সঙ্গে মিলিত হয়। পরে স্বাহা অগ্নির স্ত্রী হয়। কিন্তু অগ্নির অন্তঃপুরে এসেও স্বাহার স্বভাব পরিবর্তিত হয় না। নিজের স্বামীকে ছেড়ে, স্বাহা কৃষ্ণকে স্বামি-রূপে পাবার জন্য তপস্যা করতে থাকে। তার মানে, স্বাহা নিজ স্বামীর পরিবর্তে পরপুরুষ কৃষ্ণকেই ভজনা করত। বিষ্ণুর বরে স্বাহা দ্বাপরে নগ্নজিৎ রাজার মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করে ও কৃষ্ণকে স্বামিরূপে পায়।

মনুষ্যলোকের মতো অগ্নিও ব্যাধিমুক্ত ছিল না। মহাভারতে আছে অগ্নি শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে অতিরিক্ত হবি ভক্ষণ করে দুঃসাধ্য অগ্নিমান্দ্য

রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। পরে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে রোগমুক্ত হয়।

ꕥ ꕥ ꕥ

বৈদিক যুগের অপর প্রধান দেবতা হচ্ছে সূর্য। সূর্যের সংসারেও ছিল অশান্তি। তার স্ত্রী সংজ্ঞা তাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সংজ্ঞা বিশ্বকর্মার মেয়ে। সূর্যের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। সংজ্ঞার গর্ভে সূর্যের তিন সন্তান হয়—বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা। কিন্তু সূর্যের অসহ্য তেজ সহ্য করতে না পেরে, সংজ্ঞা নিজের অনুরূপ ছায়া নামে এক নারীকে সূর্যের কাছে রেখে, উত্তরকুরুবর্ষে ঘোটকীর রূপ ধারণ করে বিচরণ করতে থাকে। সূর্য প্রথম এটা বুঝতে পারেনি। ছায়ার সঙ্গেই সূর্য ঘর করতে থাকে এবং ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি মনু ও শনি নামে দুই পুত্র ও তপতী নামে এক কন্যা হয়। পরে সূর্য যখন এটা জানতে পারে, তখন সূর্য বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে নিজের তেজ হ্রাস করে অশ্বরূপ ধারণ করে ঘোটকীরূপিণী সংজ্ঞার কাছে এসে তার সঙ্গে সঙ্গমে রত হয়। এই মিলনের ফলে প্রথম যুগল-দেবতা অশ্বিনীকুমার ও পরে রেবন্তের জন্ম হয়। সূর্যের তেজ সংহত হয়েছে দেখে, সংজ্ঞা তখন নিজের রূপ ধারণ করে স্বামিগৃহে ফিরে আসে।

সূর্যও পরস্ত্রীতে উপগত হ'ত। মহাভারত অনুযায়ী সূর্যের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। আবার রামায়ণ অনুযায়ী ঋক্ষরজার গ্রীবায় পতিত সূর্যের বীর্য থেকে সুগ্রীবের জন্ম হয়।

সূর্যের অন্দরমহলে ঘটেছিল এক অজাচারের (**incest**) ঘটনা। যম সূর্যের পুত্র। ঋগ্বেদ অনুযায়ী যমী তার যমজ ভগিনী। ঋগ্বেদে দেখি, যমী তার যমজ ভ্রাতা যমের কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করছে। কাহিনীটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্তে আছে। সেখানে যমী যমকে বলছে, 'চল আমরা এক নির্জন স্থানে গিয়ে সহবাস করি, কেননা

বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মিবে।' যম তার উত্তরে বলে, 'তোমার গর্ভসহচর তোমার সঙ্গে এ-প্রকার সম্পর্ক কামনা করে না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী, তুমি অগম্যা।' যমী তার উত্তরে বলছে, 'যদিও মানুষের পক্ষে এরূপ সংসর্গ নিষিদ্ধ, দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকে। তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, এস এখানে আমরা উভয়ে শয়ন করি। আমি তোমার নিকট আমার নিজ দেহ সমর্পণ করে দিই।' যমের উক্তি : 'তোমার ভ্রাতার এরূপ অভিলাষ নেই।' উত্তরে যমী বলে, 'তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখছি।' (ঋগ্বেদ ১০।১০।৭-১৪)।

দেবতাদের গুরু হচ্ছে বৃহস্পতি। বৃহস্পতির অন্তঃপুরেই ঘটেছিল দেবলোকের সবচেয়ে বড় চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারি। বৃহস্পতির স্ত্রী হচ্ছে তারা। তারার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে চন্দ্র একবার তারাকে হরণ করে। এই ঘটনায় বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়ে চন্দ্রকে শাস্তি দেবার জন্য দেবতাদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তারাকে প্রত্যর্পণের জন্য দেবতা ও ঋষিগণ চন্দ্রকে অনুরোধ করে। চন্দ্র তারাকে ফেরত দিতে অসম্মত হয় এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সাহায্য প্রার্থনা করে। রুদ্রদেব বৃহস্পতির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। দেবাসুরের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধের আশঙ্কায় ব্রহ্মা মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেন। চন্দ্র তারাকে বৃহস্পতির হাতে প্রত্যর্পণ করে। কিন্তু তারা ইতিমধ্যে চন্দ্র কর্তৃক গর্ভবতী হওয়ায়, বৃহস্পতি তাকে গর্ভত্যাগ করে তার কাছে আসতে বলে। তারা গর্ভত্যাগ করার পর এক পুত্রের জন্ম হয়। এর নাম দস্যু সুত্তম। ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই পুত্র চন্দ্রের ঔরসজাত কিনা। তারা ইতিবাচক উত্তর দিলে চন্দ্র সেই পুত্রকে গ্রহণ করে ও তার নাম রাখে বুধ।

এখানে উল্লেখনীয় যে, দেবগুরু বৃহস্পতি নিজেও সাধু চরিত্রের দেবতা ছিলেন না। তিনি কামলালসায় অভিভূত হয়ে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মমতার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বলপুর্বক তার সঙ্গে সঙ্গম করেছিলেন।

কচ দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র। সঞ্জীবনীবিদ্যা হরণ করে আনবার জন্য বৃহস্পতি কচকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই উপলক্ষেই সৃষ্ট হয়েছিল শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সঙ্গে কচের অনুপম প্রেমকাহিনী।

৫৯ ৫৯ ৫৯

দেবগুরু বৃহস্পতি ছাড়া, বৈদিক যুগের তিন প্রধান দেবতার অন্দর-মহল সম্বন্ধে আমরা বললাম। এবার আমরা পৌরাণিক যুগের তিন শ্রেষ্ঠ দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অন্দরমহল সম্বন্ধে বলব। বেদ বা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহে ব্রহ্মার উল্লেখ নেই। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ব্রহ্মার স্থলে আছে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির উল্লেখ। মনুসংহিতা অনুযায়ী যিনিই ব্রহ্মা, তিনিই প্রজাপতি। তার মানে, পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মাই ছিলেন সৃষ্টিকর্তা।

সৃষ্টির প্রারম্ভেই ব্রহ্মা অজাচারে (incest) লিপ্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে নয়জন মানসপুত্র সৃষ্টি করেন। তারপর এক কন্যা সৃষ্টি করেন। এই কন্যার নাম শতরূপা। ব্রহ্মা এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে একেই বিবাহ করেন। এই কন্যার গর্ভ হতেই স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হয়। আবার অন্য কাহিনী অনুযায়ী মনুর সঙ্গে শতরূপার বিবাহ হয়েছিল এবং বিবাহান্তে মনু ও শতরূপা যখন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পিতঃ, আমরা কোন্ কর্মের দ্বারা আপনার যথোচিত সেবা করব?' ব্রহ্মা বলেছিলেন, 'তোমরা মৈথুন কর্ম দ্বারা প্রজা উৎপাদন কর। তাতেই আমার তুষ্টি।' এককথায় ব্রহ্মা এক মহান **biological truth**-এর প্রবক্তা।

তবে অধিকাংশ পুরাণ অনুযায়ী আমরা ব্রহ্মার অন্দরমহলে দেখি শতরূপার পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী হিসাবে সরস্বতীকে। ব্রহ্মার দুই কন্যা— দেবসেনা ও দৈত্যসেনা। দেবসেনা বিয়ে করেছিল শিবানীর পুত্র কার্তিকেয়কে। আর দৈত্যসেনাকে কেশী দানব বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল।

নারীর সৌন্দর্য দেখবার জন্য ব্রহ্মা লালায়িত। পুরাণে আছে, বিশ্বকর্মা যখন অপ্সরা তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করে এবং সৃষ্টির পর তিলোত্তমা যখন দেবতাদের প্রদক্ষিণ করে, তখন তাকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারদিকে চারটি মুখ সৃষ্টি হয়েছিল।

পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুর দুই স্ত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। বিষ্ণুর পুত্র কামদেব। কামদেবের স্ত্রী রতি। অথর্ববেদ অনুযায়ী কামদেব মঙ্গলময় দেবতা। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী তিনি প্রেম ও প্রণয়ের দেবতা।

শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুযায়ী পঞ্চম (রৈবত) মন্বন্তরে বিষ্ণু শুভ্রের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী বৈকুণ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মী তাঁর স্ত্রী। লক্ষ্মীর ইচ্ছা অনুযায়ী বিষ্ণু বৈকুণ্ঠলোকে তাঁর আবাসস্থল ও অন্তঃপুর স্থাপন করেন। লক্ষ্মী সাধ্বী স্ত্রী। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষ্ণু ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন। তিনি তুলসী ও বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেছিলেন।

দ্বাপরে বিষ্ণুই কৃষ্ণ। রাধিকা তার প্রণয়িনী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী, গোলোকে একদিন রাধিকা কৃষ্ণকে তুলসীর সহিত রতি-ক্রিয়ায় রত দেখে তুলসীকে অভিশাপ দেয়, 'তুই মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করবি।' কিন্তু কৃষ্ণ তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'তুমি মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তপস্যা দ্বারা আমার এক অংশ পাবে।' তুলসী শঙ্খ-

চূড়ের স্ত্রীরূপে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু ছলনা দ্বারা তুলসীর সতীত্বনাশ করে। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী শিলারূপী বিষ্ণু সর্বদা তুলসীযুক্ত হয়ে থাকেন। মতান্তরে, বিষ্ণু যখন জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন, তখন বৃন্দা বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে বিষ্ণু বৃন্দাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তুমি স্বামী জলন্ধরের সঙ্গে সহমৃতা হও। তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ এই চারিপ্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হবে।' এই কাহিনী অনুযায়ী বৃন্দা থেকেই তুলসীর উৎপত্তি।

দ্বাপরে বিষ্ণু কৃষ্ণ হয়ে যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর অন্তঃপুরে ষোল হাজার একশত স্ত্রী ছিল। (বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী ষোল হাজার একশত, ষোল হাজার নয়)। সাধারণ লোকের ধারণা, এরা সকলেই গোপকন্যা। কিন্তু সে-ধারণা ভুল। বিষ্ণুপুরাণ (৫।১১।১৪) অনুযায়ী তারা নানা দেশ থেকে অপহৃতা নারী ছিল। পুরাণে লিখিত আছে যে, একই সময় পৃথক পৃথক ভাবে কৃষ্ণ সেইসকল কন্যার ধর্মানুসারে বিধি অনুযায়ী পাণিগ্রহণ করেছিলেন, যাতে সেই কন্যাগণ প্রত্যেকে মনে করেছিল যে কৃষ্ণ শুধুমাত্র তাকেই বিবাহ করলেন। তাছাড়া, প্রতি রাত্রেই তিনি তাদের প্রত্যেকের ঘরে গমনপূর্বক বাস করতেন। ('নিশাসু চ জগৎস্রষ্টা তাসাং গেহেষু কেশবঃ')।

এবার শিবের কথায় আসা যাক। শিবের নিবাস কৈলাসে। সেখানেই তার অন্দরমহল। শিবেব অনুচররা হচ্ছে নন্দী ও ভৃঙ্গী, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরীরা ও প্রমথগণ। শিব মহাযোগী। কিন্তু শিবের ধন-দৌলত অনেক। সেজন্য শিবের একজন ধনরক্ষক ছিল। নাম যক্ষরাজ কুবের। কুবেরের পিতা পৌলস্ত্য বা বিশ্রবা, মাতা ভরদ্বাজ-কন্যা দেব-বর্ণিনী। কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই রাবণ। রাবণ লঙ্কার অধিকার চাইলে কুবের কৈলাসে গিয়ে বাস করে। শিব তাকে তার ধনরক্ষক নিযুক্ত

করে। কুবেরের স্ত্রী আহুতি; নলকুবর ও মণিগ্রীব তার দুই ছেলে ও মীনাক্ষী তার মেয়ে।

শিবকে সব দেবতাই মান্য করে। সেজন্য শিবকে মহাদেব বলা হয়। শিবের মানসম্ভ্রম-জ্ঞান খুব বেশি। ব্রহ্মা একবার শিবকে অপমানসূচক কথা বলেছিলেন বলে নিজের একটা মুণ্ড হারিয়েছিলেন। (আগে ব্রহ্মার পাঁচ মুণ্ড ছিল, কিন্তু সেই থেকেই ব্রহ্মার চার মুণ্ড হয়)। শিব অত্যন্ত রাগী মানুষ। কিন্তু আবার সহজেই তুষ্ট হন। শিব সংহারকর্তা। আবার সংহারের পর সৃষ্টিকর্তাও বটে।

অন্তঃপুরের মধ্যে শিবের মতো স্বামীকে নিয়ে ঘর করা শিবানীর পক্ষে খুব মুশকিলের ব্যাপার ছিল। শিব প্রথম বিয়ে করেছিলেন দক্ষ-কন্যা সতীকে। ভৃগুযজ্ঞে শিব শ্বশুরকে প্রণাম করেননি বলে, দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবহীন যজ্ঞ করে। সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও সেই যজ্ঞে উপস্থিত হয়। সেখানে সতীকে দেখে দক্ষ শিবনিন্দা শুরু করায়, সতী যজ্ঞস্থলে প্রাণত্যাগ করে। শিব সে-সংবাদ পেয়ে দক্ষালয়ে যায় ও দক্ষযজ্ঞ নাশ করে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। তারপর সতীর মৃতদেহ নিয়ে প্রলয়-নাচন নাচতে শুরু করেন। তখন বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড-খণ্ড করে কেটে ফেলেন। যে-সব জায়গায় সতীর দেহখণ্ড পড়ে, সে-সব জায়গাই পরে পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায়। সতী পরে জন্মান্তরে হিমালয়-কন্যা পার্বতী হয়ে জন্মগ্রহণ করে ও কঠোর তপস্যা দ্বারা শিবকে পতিরূপে পায়।

শিব অত্যন্ত সংযমী দেবতা। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা যখন তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছিল, ব্রহ্মা তখন তার চার মুণ্ড ও ইন্দ্র তার সহস্র নয়ন দিয়ে তাকে দেখেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে শিবই তখন স্থির হয়ে বসেছিলেন। সেজন্য শিবের নাম স্থাণু।

শিব সংযমী দেবতা বলে, সব সময়েই কঠোর তপস্যায় রত থাকতেন। অন্দরমহলে শিবানীর সঙ্গে তাঁর মিলন বড়একটা হ'ত না। এই মিলন ঘটাবার জন্য দেবতারা কামদেবকে নিযুক্ত করেছিল। এই

মিলনের ফলে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র জন্ম হয়। এছাড়াও শিব ও শিবানীর আরও ছেলেপুলে হয়েছিল; যথা, পুত্র গণেশ ও দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' অনুযায়ী শিব ও শিবানীর রমণক্রিয়া দেখবার জন্য অগ্নিদেবের একবার কৌতূহল হয়েছিল। সেজন্য অগ্নি পারাবতাকারে সেই রমণক্রিয়া দেখতে এসেছিল। শিবানী অগ্নিদেবকে দেখে রমণক্রিয়া হতে নিবৃত্ত হন। শিব তখন ক্রোধবশত তাঁর বীর্য অগ্নিদেবের প্রতি নিক্ষেপ করেন। অগ্নিদেব সে-বীর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে তা গঙ্গায় বিসর্জন দেয়। আর একবার শিবানীকে দেখে ফেলবার জন্য কুবেরের এক চক্ষু বিনষ্ট হয়েছিল।

মহাযোগী হলেও শিব খুব আমুদে দেবতা ছিলেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রিয় বিনোদনের উপায়। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে শিবের খুবই সুনাম ছিল। সঙ্গীতবিদ্যায় শিব নারদকেও পরাহত করেছিলেন। শিবের সঙ্গীতের শ্রোতা ছিলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। একবার নারদের গর্ব খর্ব করবার জন্য রাগরাগিণীগণ পথে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে। নারদ কারণ জানতে চাইলে তারা বলে, নারদের সুরহীন গানের জন্যই তাদের এই দুর্দশা; শিব সুললিত কণ্ঠে গান করলে তারা আবার পূর্বরূপ ফিরে পেতে পারে। নারদ তখন শিবকে বহুভাবে তুষ্ট করে, শিবকে গান করতে রাজি করান, কিন্তু শিব বলেন যে, উপযুক্ত শ্রোতা না পেলে তিনি গান করবেন না। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শ্রোতা হন।

নৃত্যেও শিবের প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। নৃত্যকুশলী বলেই শিবের নাম নটরাজ।

অন্দরমহলে শিবানী শিবের সঙ্গে কৌতুক-পরিহাস করতে ছাড়তেন না। শিবানী একবার পরিহাসচ্ছলে শিবের দুই নেত্র হস্তদ্বারা আবৃত করেন। তখন সমস্ত পৃথিবী তমাচ্ছন্ন ও আলোকবিহীন হয়। তাতে পৃথিবীর সব মানুষ বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। পৃথিবীর লোকদের রক্ষা করবার জন্য শিব তখন ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভব করেন।

স্বামী ও পুত্রদের খাওয়াতে শিবানীকে বেশ বেগ পেতে হ'ত। এর এক মনোরম চিত্র মধ্যযুগের কবি রামেশ্বর তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যে দিয়েছেন। রামেশ্বরের বর্ণনা : 'তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। / দুটি সুতে সপ্তমুখ, পঞ্চমুখ পতি॥ / তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়। / এই দিতে এল নাঞি হাঁড়ি পানে চায়॥ / সুক্ত খায়্যা ভোক্তা যদি হস্ত দিল শাকে। / অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্তি ডাকে॥ / কার্তিক গণেশ বলে অন্ন আন মা। / হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হইয়া খা॥ / উদ্বন চর্বণে ফিরা্যা ফুরাইল ব্যঞ্জন। / এককালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন॥ / চটপট পিষিত মিশ্রিত কর্যা যুষে। / বাউবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়্যা আসে॥ / চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর। / রিনি রিনি কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝনকার॥'

ঌ ঌ ঌ

দেবলোকের চিত্তবিনোদনের জন্য ছিল অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ। এরা তাদের নৃত্য, গীত ও অভিনয় দ্বারা সর্বদা মুখরিত করে রাখত ইন্দ্রের দেবসভা। অপ্সরারা ছিল দেবলোকের বারযোষিৎ। রূপলাবণ্য, সৌন্দর্য ও নৃত্য-গীতে পারদর্শিতার জন্য অপ্সরাদের ছিল বিশেষ প্রসিদ্ধি। অপ্সরাদের মধ্যে উর্বশী ছিল অনন্যাসুন্দরী। বেদে আছে যে, উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মিত্র ও বরুণের রেতঃপাত হয়েছিল। উর্বশী সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রাচীন গ্রন্থসমূহে আছে। তার মধ্যে একটা কাহিনী হচ্ছে রাজা পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর মিলন। অপর এক কাহিনী হচ্ছে অর্জুন যখন দিব্যাস্ত্র সংগ্রহের জন্য দেবলোকে গিয়েছিল, উর্বশী তখন অনঙ্গের বশবর্তী হয়ে অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিল। উর্বশী ছাড়াও দেবলোকে অপূর্ব লাবণ্যময়ী ও সুন্দরী আরও অপ্সরা ছিল; যথা—মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, সুকেশী, মঞ্জুঘোষা, অলম্বুষা, বিদ্যুৎপর্ণা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সরসা, পঞ্জিকাস্থলা ও বিশ্বাচী।

অপ্সরাদের যৌনসম্পর্ক ছিল গন্ধর্বদের সঙ্গে। সঙ্গীতবিদ্যায় তারা বিশেষ পারদর্শী ছিল। দেবলোকে তারা অপ্সরাদের সঙ্গে গায়ক হিসাবে যোগদান করত। অপ্সরাদের সঙ্গে তারা অবাধে মেলামেশা করত। সেজন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ফলে যে বিবাহ হয়, তাকে গান্ধর্ব-বিবাহ বলা হয়। অপ্সরা ও গন্ধর্বদের সমৃদ্ধিশালী পুরী ও প্রাসাদ ছিল। সেখানেই অবস্থিত ছিল তাদের অন্দরমহল। মর্ত্যের সরোবরেও তারা মাঝে মাঝে দেবকন্যাদের সঙ্গে প্রমোদ করতে আসত। (দেবলোকে প্রমীলাদের পুরুষভজনা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য লেখকের 'দেবলোকের যৌনজীবন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

বিবাহের মঞ্চে প্রমীলা

আগেই বলেছি যে বৈধভাবে প্রমীলার পুরুষভজনা নির্ভর করে সামাজিক রীতিনীতি ও বিধানের উপর। এটা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। উত্তর ভারতের হিন্দুসমাজে বিবাহ কখনও নিকট আত্মীয়ের মধ্যে হয় না। সেখানে বিবাহ গোত্র-প্রবর বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা ছাড়া, উত্তর ভারতে সপিণ্ডদের মধ্যেও কখনও বিবাহ হয় না। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজে কিন্তু তা নয়। সেখানে মামা-ভাগনী ও মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হচ্ছে বাঞ্ছনীয় বিবাহ। ওড়িশার হিন্দুসমাজে আবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে দেবর কর্তৃক বিবাহ করা বাধ্যতামূলক। হিন্দুসমাজের মতো আদিবাসী সমাজেও নিজ টটেম-গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসী সমাজভুক্ত লাখের, বাগনী ও ডাফলা জাতির লোকেরা বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করে। আসামের গারো জাতির লোকেরা বিধবা শাশুড়ীকে বিবাহ করে। ওড়িশার আদিবাসী সমাজে শবরজাতির লোকেরা বিধবা খুড়ীকে বিবাহ করে।

উত্তর ভারতের নানা স্থানে বিবাহ রাত্রিকালেই সম্পাদিত হয়। বাঙলা দেশেও তাই। কিন্তু তামিলনাড়ু ও গুজরাটে রাত্রিকালে বিবাহ নিষিদ্ধ। সেখানে বিবাহ দিনের বেলাতেই হয়। আবার উত্তর ভারতে কনের সিঁথিতে সিন্দূরদানই বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান। সিঁথিতে সিন্দুর থাকাই সেখানে সধবার লক্ষণ। দাক্ষিণ ভারতে কিন্তু তা নয়। সেখানে সিঁথিতে সিন্দুর লেপার কোনো বালাই নেই। গলায় 'তালি' বন্ধন করে দেওয়াই দক্ষিণ ভারতে বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান। গলায় 'তালি' থাকাই সেখানে সধবার লক্ষণ। উত্তর ভারতের আদিবাসী সমাজে সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যেও সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান

অনুষ্ঠান। এমনকি কোনো পুরুষ যদি কোনো মেয়ের সিঁথিতে জোর করে সিন্দূর লেপে দেয়, তা হলে তাদের স্বামী-স্ত্রীরূপে গণ্য করতে হয়। দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী সমাজে কিন্তু তালিবন্ধনই বিবাহের লক্ষণ। সেখানে গলায় তালি থাকলেই বুঝতে হবে যে, সে মেয়ে সধবা। তাছাড়া, পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। উত্তর ভারতে সধবারা পাড়ওয়ালা (বিশেষ করে লাল পাড়) শাড়ি পরে। বিধবারা সাদা থান ধুতি পরে। দক্ষিণ ভারতে সে নিয়ম নেই। রাজস্থানের শাহাপুর গ্রামে কোনো লোক যদি কোনো অনূঢ়া মেয়ের কাছ থেকে জল (পানি) চায়, তা হলে তাকে সেই মেয়েকে বিবাহ (পাণিগ্রহণ) করতে হয়।

ভারতে বিবাহের ইতিহাস ভারী চমকপ্রদ। সে ইতিহাস আমি দিয়েছি আমার 'ভারতে বিবাহের ইতিহাস' ও 'সেক্স্ অ্যাণ্ড ম্যারেজ ইন ইণ্ডিয়া' নামে বই দু'খানায়। ঋগ্বেদের যুগে মাত্র দু'রকমের বিবাহ প্রচলিত ছিল। একরকম বিবাহে বাপ-মা নিজেরা নির্বাচন করে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিত। আর একরকম বিবাহে 'সমান' উৎসবে (এই উৎসব অনেকটা আজকালের 'অলিম্পিক' উৎসবের মতো) ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলামেশা করে নিজেরাই মনোমতো স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন করত। তারপর চাররকম বিবাহের উদ্ভব হয়; যথা —ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষস -বিবাহ। এর মধ্যে মাত্র ব্রাহ্ম-বিবাহেই মন্ত্র উচ্চারণ ও যজ্ঞ সম্পাদনের প্রয়োজন হ'ত। বাকি তিনরকম বিবাহে এসবের কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু স্মৃতিতে আমরা আটরকম বিবাহের উল্লেখ পাই। এই আটরকম বিবাহ হচ্ছে যথাক্রমে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ব্রাহ্ম-বিবাহ ছিল ব্রাহ্মণ্য আচারসম্পৃক্ত বিবাহ। এই

বিবাহে মন্ত্র উচ্চারণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করে সবস্ত্রা, সালঙ্কারা ও সুসজ্জিতা কন্যাকে বরের হাতে সম্প্রদান করা হ'ত। আর প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে যে বিবাহ প্রচলিত ছিল, তার নাম ছিল আর্ষ-বিবাহ। এই বিবাহে যজ্ঞে ব্যবহৃত ঘৃত প্রস্তুতের জন্য মেয়ের বাবাকে বর একজোড়া গোমিথুন উপহার দিত। যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা হিসাবে যেখানে কন্যা দান করা হ'ত, তাকে বলা হ'ত দৈব-বিবাহ। 'তোমরা দুজনে যুক্ত হয়ে ধর্মাচরণ কর'—এই উপদেশ দিয়ে যেখানে বরের হাতে মেয়েকে দেওয়া হ'ত, তাকে বলা হ'ত প্রাজাপত্য-বিবাহ। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ ও গৃহ্যসূত্রসমূহ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বৈদিক যুগে বিবাহ প্রাপ্তবয়স্ক বর-কনের মধ্যেই সংঘটিত হ'ত। বিবাহ কনের বাড়িতেই হ'ত। ঋগ্বেদের যুগে বিবাহের কোনো আনুষ্ঠানিক বাহুল্য ছিল না। আনুষ্ঠানিক বাহুল্য গৃহ্যসূত্রের যুগে উদ্ভূত হয়।

বলা বাহুল্য, আগের অনুচ্ছেদে বর্ণিত চাররকম বিবাহেরই কৌলীন্য ছিল। বাকিগুলির কোনো কৌলীন্য ছিল না। কেননা সেগুলি প্রাগ্‌বৈদিক আদিবাসী সমাজ থেকে নেওয়া হয়েছিল। তার প্রমাণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সেগুলি আদিবাসী সমাজে এখনও প্রচলিত আছে। আসুর-বিবাহ ছিল পয়সা দিয়ে মেয়ে কেনা। তার মানে, আসুর-বিবাহে কন্যাপণ নেওয়া হ'ত। আর মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়ে যে-বিবাহ করা হ'ত, তার নাম ছিল রাক্ষস-বিবাহ। আর মেয়েকে অজ্ঞান ও অচৈতন্য অবস্থায় হরণ করে এনে বা প্রবঞ্চনা অথবা ছলনা দ্বারা যে বিবাহ করা হ'ত, তাকে বলা হ'ত পৈশাচ-বিবাহ। আর নির্জনে প্রেমালাপ করে যেখানে স্বেচ্ছায় মাল্যদান করা হ'ত, তাকে বলা হ'ত গান্ধর্ব-বিবাহ। গঙ্গার সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ, ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার বিবাহ, অর্জুনের সঙ্গে উলুপী ও চিত্রাঙ্গদার বিবাহ, দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার বিবাহ ও ইক্ষাকুবংশীয় পরীক্ষিতের সঙ্গে সুশোভনার বিবাহ—এসবই গান্ধর্বমতে বিবাহের দৃষ্টান্ত। তবে রাজারাজড়ার ঘরে স্বয়ম্বর

প্রথায় বিবাহই ছিল আদর্শ বিবাহ। স্বয়ম্বর-বিবাহ ছিল রাক্ষস-বিবাহেরই একটা সুষ্ঠু সংস্করণ। কাশীরাজার তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ম্বরসভায় ভীষ্ম বলেছিলেন—'স্মৃতিকারগণ বলেছেন যে স্বয়ম্বরসভায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাহত করে কন্যা জয় করাই ক্ষত্রিয়দের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিবাহ।'

ঐতিহাসিক যুগে পরাহত রাজার মেয়েকে বিবাহ করাও রাক্ষস-বিবাহেরই আর এক সংস্করণ। এরূপ বিবাহ ঘটেছিল সেলুকসের মেয়ের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এবং পালবংশীয় সম্রাট ধর্মপালের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটরাজা পরবলের মেয়ে রন্নাদেবীর ও দুর্লভরাজের মেয়ে মাহটাদেবীর বিবাহ, বিগ্রহপালের সঙ্গে হৈহয় বা কলচুরি-বংশীয় রাজকন্যা লজ্জাদেবীর বিবাহ, রাজ্যপালের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটরাজা তুঙ্গের মেয়ে ভাগ্যদেবীর বিবাহ, তৃতীয় বিগ্রহপালের সঙ্গে কলচুরিরাজ কর্ণের মেয়ে যৌবনশ্রীর, ও রামপালের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটরাজের মেয়ে মদনদেবীর বিবাহ। আবার ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখি কামরূপ রাজাকে যুদ্ধে পরাহত করে লাউসেন রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করেছিলেন।

আগেকার দিনে বাঙালি সমাজে একরকম বিবাহ প্রচলিত ছিল, যাকে নৃতত্ত্ববিদগণ শালীবরণ বলেন। শালীবরণ মানে একই পাত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে সকল কন্যার বিবাহ দেওয়া। নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা অনুযায়ী শালীবরণ প্রথাটা হচ্ছে—যদি কোনো পুরুষ কোনো মেয়েকে বিবাহ করতে চায়, তা হলে সেই বিবাহের সঙ্গে তার বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকার থাকে ওই মেয়ের অন্যান্য কনিষ্ঠা বোনদেরও বিবাহ করবার। মৌলিক তার মানে 'ক' যদি 'খ'-কে বিবাহ করে, তা হলে 'ক'-এর ওই অধিকার অনুযায়ী সে 'খ'-এর অন্যান্য ছোট বোনদেরও বিবাহসূত্রে উপহার পায়। বাঙলার প্রাচীন গীতিকাব্য 'ময়নামতীর গান'-এ

আমরা দেখি যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র গোপীচন্দ্রের সঙ্গে "অতুনার বিয়া দিয়া পতুনা করিল দান"। আবার 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে দেখি যে, কামরূপ-রাজার সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফেরবার পথে মঙ্গলকোটে লাউসেন বর্ধমানের রাজকন্যা অমলাকে বিবাহ করে তাঁর বোন বিমলাকে উপহার পেয়েছিলেন। একসঙ্গে একাধিক ভগ্নীকে বিবাহ করবার প্রথা না থাকলে এরূপভাবে কন্যাকে দান করার কথা উঠতেই পারে না। মনে হয় অতীতের কোনো এককালে আর্থিক বা সামাজিক কারণে এই প্রথা রহিত হয়েছিল। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, পাত্র যখন শালীদের ওপর তার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছে, তখন তাকে কী ভাবে প্রীত করা যেতে পারে। তখনকার দিনে তাকে প্রীত করবার জন্য কী প্রতিদানের ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল, জানি না। তবে বর্তমানে প্রচলিত 'জামাই-বরণ' প্রথা যে তার লুপ্ত স্মৃতি বহন করছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'জামাইবরণ'টা কী? এটা সকলেরই জানা আছে যে, বিবাহের পূর্বমূহূর্তে জ্যেষ্ঠ জামাই বা জামাইদের বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রীত না করলে, কনিষ্ঠা শালীর পাণিপ্রার্থী কোনো বরই বিবাহে বসতে পারে না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, জ্যেষ্ঠ জামাইকে প্রীত করবার কারণ কী এবং তাকে প্রীত না করলে কনিষ্ঠা শালীর বিবাহই বা হতে পারে না কেন? তার যে কোনো অধিকার ছিল এবং তাকে তার সে-অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলেই তাকে প্রীত করা হচ্ছে, এটাই হচ্ছে 'জামাইবরণ'-এর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। সে অধিকারটা যে শালীবরণের অধিকার সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আরও একটা কথা আছে। জ্যেষ্ঠ জামাইদের সঙ্গে শালীদের ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করবার যে সামাজিক এবং লৌকিক অধিকার আছে, তা-ও সেই লুপ্ত শালীবরণ প্রথারই স্মৃতিচিহ্ন।

মনে হয় যে, অনুরূপভাবে বাঙালি সমাজে একসময় 'দেবরণ' প্রথাও প্রচলিত ছিল। দেবরণ হচ্ছে শালীবরণের বিপরীত প্রথা। শালীবরণে স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীদের ওপর জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতির যৌন অধিকার থাকে। আর দেবরণে জ্যেষ্ঠ ভাবীর ওপর দেবরের অধিকার। পঞ্চপাণ্ডব যখন বীরভূম জেলার একচক্রা নগরে এসে বাস করেছিলেন, তখন তাঁরা পঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীকে এই প্রথা অনুযায়ীই বিবাহ করেছিলেন। (পঞ্চাল রাজ্য যে প্রাচ্য ভারতেই অবস্থিত ছিল সে-সম্বন্ধে আলোচনা লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', পৃষ্ঠা ২৫-এ দ্রষ্টব্য।)

দেবরণ এখনও বাঙলার সাঁওতাল সমাজে ও ওড়িশার জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত আছে। বর্তমান বাঙালির বিবাহপ্রথার মধ্যেও এর নিদর্শন আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন বিবাহ করে নববধূকে নিয়ে গৃহে ফিরে আসে, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা তার পথরোধ করে তাকে প্রশ্ন করে—'দাদা, আমার বিয়ে দেবে তো?' জ্যেষ্ঠ সম্মতি জ্ঞাপন করলে, তবেই নববধূকে নিয়ে সে গৃহে প্রবেশ করতে পারে। এটাও কনিষ্ঠের অধিকার সমর্পণ করার নিদর্শন। ভাবীর সঙ্গে কনিষ্ঠ দেবরের যে ঘনিষ্ঠ ব্যবহার ও সংলাপ, তা-ও কোনো এক সুদূর প্রাচীনকালে বাঙালি সমাজে 'দেবরণ' প্রথা প্রচলন থাকার লুপ্ত চিহ্নমাত্র। এটাই এর নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। (যাঁরা এ সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতে আগ্রহী, তাঁরা আমার 'ডিনামিক্স অফ্ সিনথেসিস ইন হিন্দু কালচার' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাম্ বেঙ্গলি কিনশিপ ইউসেজেস্' নিবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন।)

মনে হয় শালীবরণ ও দেবরণ প্রথা একমাত্র বাঙলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঙলার বাইরেও ছিল। কেননা, মহাভারতে পড়ি, বিচিত্রবীর্য অম্বিকা ও অম্বালিকাকে একসঙ্গেই বিবাহ করেছিলেন। আবার নাভিও দুই যমজ ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন। অর্ধমাগধী

ভাষায় রচিত জৈন সাহিত্যেও এরূপ বিবাহের উল্লেখ আছে। এরূপে বিবাহিতা দুই যমজ ভগিনীর অন্যতরা মরুদেবী জৈন তীর্থংকর ঋষভের মাতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব দেবকরাজার সাত কন্যাকে বিবাহ করেছিল। কংসও জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিল।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের এক স্তোত্র থেকে বোঝা যায় যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী দেবরের সঙ্গেই স্ত্রীরূপে বাস করত। সেখানে বিধবাকে বলা হচ্ছে—'তুমি উঠে পড়, যে দেবৃ তোমার হাত ধরছে তুমি তারই স্ত্রী হয়ে তার সঙ্গে বসবাস কর।' অথর্ববেদের (১০/৩/১-২) এক স্তোত্রেও অনুরূপ কথা ধ্বনিত হয়েছে। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, ভাবীর ওপর দেবরের এই যৌন অধিকার পরবর্তী-কালের নিয়োগ প্রথা থেকে স্বতন্ত্র। এ অধিকার সাধারণ রমণের অধিকার। আর নিয়োগ প্রথা মাত্র সন্তান উৎপাদনের অধিকার।

বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচ্য ভারতে একসময় নিজ ভগিনীকে বিবাহ করার প্রথাও প্রচলিত ছিল। 'সুত্তনিপাত' (৪২০) অনুযায়ী বৈশালীর রাজা ওক্ককের প্রধানা মহিষীর গর্ভে পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ওই প্রধানা মহিষীর মৃত্যুর পর রাজা এক যুবতীকে বিবাহ করেন। এই রানীর যখন এক পুত্র হয়, তখন তিনি রাজাকে বলেন যে, তাঁর ছেলেকেই রাজা করতে হবে। রাজা তাঁর প্রথমা মহিষীর পাঁচ পুত্র ও চার কন্যাকে হিমালয়ের পাদদেশে নির্বাসিত করেন। সেখানে কপিলমুনির সঙ্গে তাদের দেখা হয়। কপিলমুনি তাদের সেখানে একটি নগর স্থাপন করে বসবাস করতে বলেন। এই নগরের নামই কপিলাবস্তু হয়। ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অকৃতদার থাকে। আর বাকি চার ভাই চার বোনকে বিবাহ করে।

বৌদ্ধ সাহিত্যের আর এক কাহিনী (অশ্বতথ সূক্ত ১/১৬, কুণাল

জাতক ৫৩৬) অনুযায়ী শাক্যরা ছিল পাঁচ বোন ও চার ভাই। জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে তারা মাতৃরূপে বরণ করে, আর চার ভাই চার বোনকে বিবাহ করে। জ্যেষ্ঠা পরে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা হয়, এবং তাকে বনমধ্যে এক গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসা হয়। একদিন সে ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হলে, বারাণসীর রাজা রাম এসে তাকে উদ্ধার করেন। রামও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে বনে নির্বাসিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি নিজেকে নিরাময় করেন। তিনি নিরাময় করবার উপায় জানতেন এবং সেই উপায় দ্বারা ওই মেয়েটিকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করেন। তারপর তাঁদের দুজনের মধ্যে বিবাহ হয় এবং তাঁদের যে সন্তান হয়, তাদের কপিলাবস্তু নগরে তাদের মাতুলকন্যাদের বিবাহ করবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। (তুলনীয় : দক্ষিণ ভারতে মাতুলকন্যা বিবাহ)

বৌদ্ধ সাহিত্যের (বুদ্ধঘোষের 'পরমথজ্যোতিকা,' 'ক্ষুদ্দকপথ') আর এক কাহিনী অনুযায়ী বারাণসীর রাজার প্রধানা মহিষী একখণ্ড মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। তিনি ওই মাংসপিণ্ডটিকে একটি পেটিকায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। এটা যখন ভেসে যাচ্ছিল, তখন একজন মুনি ওটাকে তুলে সংরক্ষণ করেন। পরে ওই মাংসপিণ্ড থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মায়। তাদের নাম লিচ্ছবী দেওয়া হয়। এদের দুজনের মধ্যে বিবাহ হয় এবং তারা বৈশালী রাজ্য স্থাপন করে।

বৌদ্ধ সাহিত্যের এইসকল কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, হিমালয়ের পাদদেশের রাজ্যসমূহে সহোদরা ও মাতুলকন্যা বিবাহ প্রচলিত ছিল।

(বৌদ্ধ সাহিত্যের এই অংশ 'প্রমীলা কেন পুরুষ ভজে?' নিবন্ধেও বিবৃত হয়েছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন আছে বলেই দেওয়া হল)।

মধ্যযুগের সমাজকে কলঙ্কিত করেছিল কৌলীন্য প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিবাহ। কৌলীন্য প্রথা এনেছিল এক অসামান্য জটিলতা। এ প্রথা বিশেষ করে প্রচলিত ছিল বাঙলা ও মিথিলায়। বাঙালি ব্রাহ্মণ সমাজে রাঢ়ী শ্রেণীর মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়দের কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রথাটি ছিল কন্যাগত। তার মানে কুলীনের ছেলে অকুলীনের মেয়েকে বিবাহ করতে পারত, কিন্তু কুলীনের মেয়ের বিবাহ কুলীনের ছেলের সঙ্গেই দিতে হ'ত। অকুলীনের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে, মেয়ের বাবার কৌলীন্য ভঙ্গ হ'ত। সুতরাং কুলরক্ষার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণ পিতাকে যেন-তেন প্রকারে কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়ে, নিজের কুলরক্ষা করতে হ'ত। তার কারণ, অনূঢ়া মেয়েকে ঘরে রাখা বিপদের ব্যাপার ছিল। একদিকে তো সমাজ তাকে একঘরে করত, আর অপরদিকে ছিল যবনের নারী-লোলুপতা। অনেকসময় যবনেরা নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে (এমনকি বিবাহমণ্ডপ থেকে) নিকা করতে কুণ্ঠাবোধ করত না।

কুলীন ব্রাহ্মণগণ অগণিত বিবাহ করত এবং স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে রেখে দিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে লিখেছিলেন—'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে। / যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥ / যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই। / বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই ॥ / বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে। / পুনর্বিয়া হবে কিনা বিয়া হবে আগে ॥ / বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি খাটি। / জাতির যেমন হোক কুলে বড় আটি ॥ / দু-চারি বৎসরে যদি আসে একবার। / শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার ॥ / সূতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়। / তবে মিষ্টি মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥'

এরূপ প্রবাসভর্তৃক সমাজে কুলীন কন্যাগণ যে সবক্ষেত্রেই সতী-সাবিত্রীর জীবন যাপন করতেন, সে কথা হলপ করে বলা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও বিদ্যাসাগরমশায় বলে

গেছেন যে এরূপ কুলীন কন্যাগণ প্রায়ই জারজ সন্তান প্রসব করতেন। কী ভাবে তা গোপন ক'রে, সে-সব সন্তানের বৈধতা কৌশলে প্রকাশ করা হ'ত, তা-ও তাঁরা বর্ণনা করে গেছেন। এর ফলে, বাঙলার কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে যে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মৈথিলী সমাজে মেয়ের বাবারা শোনপুরের মেলায় পাত্র কিনে নিয়ে আসে (লেখকের 'সেক্স্ অ্যাণ্ড ম্যারেজ্ ইন ইণ্ডিয়া', পৃষ্ঠা ১৭১ দ্রষ্টব্য)। সাধারণত পাত্রের বয়স ৭ থেকে ১৫ হয়। বয়স অনুযায়ী বরের দাম কম-বেশি হয়। বরের বয়স কম হলে, দাম কম লাগে; বয়স বেশি হলে, দাম বেশি হয়। মেয়ের বাবা ক্রীত পাত্রকে বহির্বাটীতে রাখেন। তাকে অন্দরমহলে আসতে দেওয়া হয় না। তাকে গোচারণ ও কৃষিকর্মে নিযুক্ত করা হয়। তারপর উপযুক্ত বয়স হলে, তাকে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিবাহের পরও রাত-দুপুর পর্যন্ত অন্দরমহলে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। রাত-দুপুরে সে অন্দরমহলে শোবার জন্য আসে। কিন্তু প্রভাত হবার পূর্বেই তাকে আবার বহির্বাটীতে ফিরে যেতে হয়। গৌনা অনুষ্ঠানের পরই বর-কনে স্বামী-স্ত্রীরূপে পৃথক সংসার পাততে পারে।

সেকালে দেবতার প্রীতির জন্য অনেকে নিজের মেয়েদের দেবতার সঙ্গে বিয়ে দিতেন। এরা মন্দিরে থাকত এবং এদের দেবদাসী বলা হ'ত। এদেরকে উত্তমরূপে নাচ-গান শেখানো হ'ত এবং তারা দেবতার সামনে নৃত্যগীত করত। দেবদাসী যে হিন্দু মন্দিরেই থাকত, তা নয়, বৌদ্ধ মন্দিরেও থাকত। কালক্রমে দেবদাসী প্রথা কদর্য গণিকাবৃত্তিতে

পরিণত হয়েছিল। স্বাধীনোত্তরকালে আইন দ্বারা দেবদাসী প্রথা নিবারিত হয়েছে ; কিন্তু গোপনে এ-প্রথা এখনও চালু আছে। সম্প্রতি রাজ্যসভায় নারীকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মারগারেট আলভা প্রকাশ করেছেন যে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও দেশে দেবদাসীর সংখ্যা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। শুধু তাই নয়, কমার চেয়ে বরং এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

হিন্দুসমাজে বৃক্ষ বা জড় পদার্থের সঙ্গেও বিকল্প বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, বিবাহে অযুগ্ম সংখ্যা অত্যন্ত অশুভ। সেই কারণে কোনো ব্যক্তি যখন তৃতীয়বার বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে অযুগ্ম তৃতীয়বারের অশুভত্ব খণ্ডন করবার জন্য কোনো বৃক্ষ বা জড় পদার্থের সঙ্গে বিকল্প বিবাহের পর নির্বাচিত কন্যাকে বিবাহ করে।

গণিকাদের মধ্যেও এরূপ বিকল্প বিবাহ প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে হিন্দু গণিকাদের মধ্যে বিবাহ সাধারণত কোনো জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বা ভাড়া-করা বৈষ্ণব অথবা কোনো গাছের সঙ্গে দেওয়া হয়। মুসলমান গণিকারা এরূপ বিবাহ তরবারি বা ছুরিকার সঙ্গে করে।

বিপ্লবের সাথী প্রমীলা

অন্তঃপুরে থেকেই যে প্রমীলা পুরুষ ভজে, তা নয়। বিপ্লবেও সে পুরুষের সাথী হয়। অন্তত বাংলা উপন্যাসে আমরা তাই দেখি। বাংলা উপন্যাসে বিপ্লবী নারীর সংখ্যা খুবই কম। এখানে আমরা মাত্র পাঁচজন বিপ্লবী নারীর কাহিনী বিবৃত করছি। যে পাঁচখানা উপন্যাসে আমরা এদের সাক্ষাৎ পাই, সে পাঁচখানা উপন্যাস হচ্ছে বঙ্কিমের 'ত্রয়ী'—যথা আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়। বঙ্কিমের নায়িকারা হচ্ছে শান্তি, প্রফুল্ল ও শ্রী, শরৎচন্দ্রের সুমিত্রা ও রবীন্দ্রনাথের এলা। প্রথম তিনজন নায়িকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর বিস্রস্ত ইতিহাসের বিশৃঙ্খলতার মধ্যে, আর শেষের তুজনের বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের চঞ্চলতার মধ্যে। প্রথম তিনজন ছিল বিবাহিতা; শেষের তুজন অবিবাহিতা।

শান্তি ও প্রফুল্লর কর্মব্যঞ্জনার অভিকেন্দ্র ছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির অভ্যন্তরে। অনাবৃষ্টির জন্য ফসল হয়নি। তুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় সমগ্র দেশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। অনশনে ও মহামারীতে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ তখন রাজস্ব-আদায়ের কর্তা। দেশের এই নিদারুণ তুঃসময়ে রেজা খাঁ একেবারে শতকরা দশ টাকা হারে রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। জমিদাররা রাজস্ব দিতে পারল না। হেষ্টিংস ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় ইজারাদার দেবীসিংহ জমিদারীসমূহ জলের দামে কিনে নিল। জমিদারদের ঋণ শোধ হল না। দেনার ওপর দেনা হল। দেবীসিংহের অত্যাচার বাড়তে লাগল। দেশকে অত্যাচার ও অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সন্ন্যাসীরা রুখে দাঁড়াল। সাধারণ গৃহীরাও

সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিল। সন্ন্যাসীদের সেই কর্মযজ্ঞ অবলম্বন করেই রচিত হয়েছিল আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী।

সীতারামের পটভূমিকা আরও ষাট-সত্তর বছর আগেকার। মুরশিদকুলি খাঁ তখন বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত। তাঁর আমলে বাঙলার সর্বত্র হিন্দুর ওপর নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচার চলেছিল। মুরশিদকুলি শুনলেন বাঙলার সর্বত্র হিন্দু ধুলায় লুণ্ঠিত, কেবল ভৌমিক সীতারামের রাজ্যেই তাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি ফৌজদার তোরাব খাঁর প্রতি আদেশ পাঠালেন—'সীতারামকে বিনাশ কর'। সেই পরিস্থিতিতেই সীতারাম রচিত।

বঙ্কিমের তিনখানি উপন্যাসই ঐতিহাসিক মহাকাব্য। কিন্তু উপন্যাসগুলি ঘটনাপ্রবাহের নিছক অনুবৃত্তি নয়। জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্যকে বঙ্কিম তাঁর অসামান্য সংহতি প্রতিভার সাহায্যে ছন্দোবদ্ধ করে এক মূর্তিমতী কল্পলোকের সৃষ্টি করেছিলেন। সে-কল্পলোকের মানুষরা হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্নটা সম্পূর্ণ বঙ্কিমের নিজস্ব। অনুশীলনতত্ত্বের উন্মাদনা তখন বঙ্কিমকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেই কুহেলিকাময় আচ্ছন্নতার মুকুরেই বঙ্কিম হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্নবিলাসে মত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বাঙলায় এরূপ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের কথা লেখে না।

পথের দাবী ও চার অধ্যায়ের পটভূমিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উদ্দেশ্যও পৃথক। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দেশের মধ্যে যে সন্ত্রাসবাদ প্রকাশ পেয়েছিল, তারই পটভূমিকায় পথের দাবী ব্রহ্মদেশের কলকারখানার মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রয়াসের ইতিহাস।

চার অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ত্রিশের দশকে। দেশের তরুণ-তরুণীরা যখন স্বাদেশিকতার মাদকতায় মত্ত হয়ে দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছিল, এখানি তারই এক বাঙ্ময় ব্যঞ্জনা।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ, এই উভয়েরই মননশীলতায় অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত হয়েছিল গীতার শিক্ষা ও আদর্শ। শান্তি সত্যানন্দকে বলছে—'অর্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালিয়েছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?' আবার চার অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে এলাকে বলিয়েছেন—'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না, কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হবে।'

বিপ্লবের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন। সেদিক থেকে পাঁচখানা উপন্যাসের ফলশ্রুতি একই। বর্ণিত বিপ্লবসমূহের ফল ছিল নেতিবাচক। বঙ্কিমের তিনখানা উপন্যাসেই বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা। ইতিহাস বলে যে এরূপ কিছু ঘটেনি। তিন উপন্যাসের উপসংহারও তাই বলে। শান্তি ও প্রফুল্ল ফিরে এসেছিল ব্রহ্মচারিণীরূপে নিজ নিজ গৃহে। শ্রী-ও ফিরে আসতে চেয়েছিল সীতারামের সঙ্গিনীরূপে, কিন্তু বিপরীত স্রোতে পড়ে সে সন্ন্যাসিনীই থেকে গিয়েছিল। এদিক থেকে এই তিন নায়িকার মধ্যে একটা মিল আছে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মদেশের কলকারখানার মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের ন্যায্য অধিকার অর্জনের জন্য বিপ্লব ঘটানো। যে কাহিনী শরৎচন্দ্র বিবৃত করেছেন, সে কাহিনী অনুযায়ী এ-বিষয়ে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য বিফল হয়েছিল। সুমিত্রা ফিরে গিয়েছিল ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য।

এ চারখানা উপন্যাসের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি ও অবাস্তবতাও আছে। কিন্তু তা বিবর্ণ করেনি মূল কাহিনীকে। সত্য ও কল্পনা আলো-ছায়ার মতো পরস্পরকে জড়িয়ে থেকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে বিশাল মহাকাব্যিক ঘটনাধারার চমকপ্রদ চালচিত্র। অবাস্তবতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' অনেকটা মুক্ত। কল্পনার চেয়ে সত্যকেই সেখানে দেওয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠ আসন। তরুণ-তরুণীরা কোন

উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যখন দলবদ্ধ হয় ও পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে, তখন যা ঘটে, রবীন্দ্রনাথ সেই বাস্তব ও জৈবসত্যের বাসরঘরে শেষচুম্বন দিয়েই তাঁর কাহিনীর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

শান্তিকে আমরা পাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পদচিহ্নে উদ্ভূত সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মধ্যে। শান্তি চরিত্র বঙ্কিমের এক অনুপম সৃজন। শান্তির পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ। অতি শৈশবেই শান্তির মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। সেজন্য গৃহে আর কোন লোক ছিল না। বঙ্কিম লিখেছেন—'যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে প্রধান'। পিতা যখন টোলে ছাত্রদের পড়াতেন, শান্তি তখন তাঁর কাছে বসে থাকত। টোলের ছাত্ররা শান্তিকে আদর করত। শান্তি তাদের সঙ্গেই খেলা করত, তাদের কোলে-পিঠে চড়ত। এভাবে নিয়ত পুরুষ-সাহচর্যের ফলে, শান্তি মেয়ের মতো কাপড় পরতে শিখল না। ছেলের মতো কোঁচা করে কাপড় পরত। টোলের ছাত্ররা খোঁপা বাঁধে না, সুতরাং শান্তিও খোঁপা বাঁধত না। বড় হলে টোলের ছাত্ররা যা পড়ত, শান্তিও শুনে শুনে তা শিখত। এভাবে শান্তি ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সমেত মুখস্থ করতে লাগল। এইসব দেখেশুনে শান্তির পিতা শান্তিকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও দু-একখানা সাহিত্যও পড়ালেন। তারপর শান্তির পিতৃবিয়োগ হল। টোল উঠে গেল। শান্তি নিরাশ্রয় হল। একজন ছাত্র তাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। সে-ই পরে সন্তান সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে জীবানন্দ নাম গ্রহণ করেছিল। জীবানন্দের পিতামাতা শান্তির সঙ্গে জীবানন্দের বিবাহ দিল। কিন্তু বিবাহের পর সকলেই অনুতাপ করতে লাগল। কেননা, শান্তি মেয়েদের মতো কাপড় পরল না, চুল বাঁধল না, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে লাগল। নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়ে কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায়

দুর্লভ ফুল এইসব খুঁজে বেড়াতে লাগল। শ্বশুর-শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, শেষে প্রহার ক'রে, শিকল দিয়ে শান্তিকে বেঁধে রাখল। একদিন খোলা পেয়ে, কাউকে কিছু না বলে শান্তি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল।

শান্তি বালক সন্ন্যাসীবেশে এক সন্ন্যাসীর দলে গিয়ে ভিড়ল। বঙ্কিম বলেছেন: 'তখনকার দিনের সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ এবং অন্যান্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর একপ্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার সর্বস্ব লুঠিয়া খাইত।' বলিষ্ঠ বালক পেলেই তারা তাকে নিজেদের দলভুক্ত করে নিত। শান্তির বুদ্ধির চাতুর্য, চতুরতা এবং কর্মদক্ষতা দেখে, তারা তাকে নিজেদের দলভুক্ত করে নিল। তাদের দলে থেকে শান্তি ব্যায়াম করত এবং পরিশ্রম-সহিষ্ণু হয়ে উঠল। ক্রমশ শান্তির যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু সবাই নয়। একজন সন্ন্যাসী শান্তিকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করলে শান্তি সন্ন্যাসীর দল ছেড়ে পালিয়ে নিজের গৃহে ফিরে এল। শাশুড়ী তাকে স্থান দিল না। জীবানন্দের বোন নিমাইয়ের বিবাহ হয়েছিল ভৈরবপুরে। ভগ্নীপতির সঙ্গে জীবানন্দের খুবই সদ্ভাব। জীবানন্দ শান্তিকে ভৈরবপুরে নিয়ে গেল এবং সেখানেই সুখে বসবাস করতে আরম্ভ করল। তারপর জীবানন্দ এক-দিন সন্তানধর্ম গ্রহণ করে শান্তিকে ছেড়ে চলে গেল। শান্তি একাই রুক্ষকেশে ছিন্নবসনে নিজের পর্ণকুটিরে বাস করতে লাগল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অনুবর্তনে বাঙলায় বড় গুরুতর ব্যাপার ঘটেছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তার অন্যতম প্রকাশ। বঙ্কিমের আনন্দমঠে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের যে চিত্রপট দেওয়া হয়েছে, সেই চিত্রপট অনুযায়ী বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন সত্যানন্দ। তাঁর তিন উপযুক্ত সহকর্মী ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন জীবানন্দ, ভবানন্দ ও জ্ঞানানন্দ। গভীর অরণ্যের মধ্যে তাঁরা নিজেদের আস্তানা করেছিলেন। আশ্রমবাসী ও

গৃহী সন্ন্যাসীর সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদের ব্রত ছিল যতদিন না যবনের হাত থেকে দেশমাতার উদ্ধার হয়, ততদিন তারা ব্রহ্মচর্য পালন করবে ও গৃহধর্ম ত্যাগ করবে। আত্মীয়স্বজন সকলের সংস্রব ত্যাগ করবে ও ইন্দ্রিয় জয় করবে। বঙ্কিম সত্যানন্দের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসলমানরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।'

রাজসরকার থেকে কলকাতায় যে খাজনা চালান যাচ্ছিল, সন্ন্যাসীরা তা লুঠে নিল। নিকটে সত্যানন্দকে পেয়ে সিপাহীরা তাকে বন্দী করল। সত্যানন্দকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছেন জীবানন্দ। সত্যানন্দের সমীপবর্তী হলে জীবানন্দ শুনলেন, সত্যানন্দ গাইছেন—'ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী'। এটা সত্যানন্দের সঙ্কেত বুঝতে পেরে জীবানন্দ নদীর ধারে গেলেন। সেখানে দেখলেন এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিত শিশুকন্যা। জীবানন্দ শিশু-কন্যাটিকে তুলে নিয়ে ভৈরবপুরে তাঁর ভগিনী নিমাইয়ের নিকট রাখতে এলেন। নিমাই কৌশলে জীবানন্দের সঙ্গে শান্তির সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিল। শান্তিকে দেখে জীবানন্দের বড় দুঃখ হল। জীবানন্দ বললেন, 'দেশ নিয়ে আমি কি করব? তোমা হেন স্ত্রীকে আমি কেন ত্যাগ করলাম।' জীবানন্দ সন্তানধর্ম ত্যাগ করতে মনস্থ। শান্তি বলল—'ছি—তুমি বীর! আমার পৃথিবীতে বড সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম ত্যাগ করবে? তোমার বীরধর্ম কখনও তুমি ত্যাগ কোরো না।'

নিজ কুটিরে প্রত্যাগমন করেই শান্তি সিদ্ধান্ত করে ফেলল যে স্বামী যে-ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন, সহধর্মিণী হিসাবে তার পক্ষেও সেই-ধর্মই অনুসরণ করা কর্তব্য। একখানা শাড়ির পাড় ছিঁড়ে কাপড়-খানাকে গেরিমাটি দিয়ে গেরুয়া বসনে পরিণত করল। নিজের মাথার চুল কেটে নকল গোঁফ-দাড়ি তৈরি করল। তারপর 'সেই

গৈরিক বসনখানি অর্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল।' এভাবে সজ্জিত হয়ে সেই নূতন সন্ন্যাসী রাত্রি দ্বিপ্রহরের অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করল। চলতে চলতে গাইতে লাগল—'সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে/হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে/ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে/তুমি কার, কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে/ রমণীতে না সাধ, রণজয় গাওরে॥'

পরদিন প্রভাতে আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায় দেখল যে মঠে এক নূতন সন্ন্যাসী এসেছে সন্তানধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য। মঠাধ্যক্ষ সত্যানন্দ তাকে দীক্ষিত করলেন ও তার নাম দিলেন নবীনানন্দ। কিন্তু সত্যানন্দকে সে প্রতারিত করতে পারল না। নূতন নাম দেবার পর সত্যানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্বে কি নাম ছিল?' শান্তি বলল—'আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্মা।' উত্তরে সত্যানন্দ বললেন—'তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।' এই বলে সত্যানন্দ শান্তির জাল দাড়ি টেনে খসিয়ে দিলেন। তারপর স্ত্রীলোকের বাহুবলের প্রশ্ন উঠল। সত্যানন্দ বললেন—'সন্তানরা বাহুবলের পরিচয় দেয় এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিয়ে। যে গুণ দিতে পারে, সে-ই প্রকৃত বলবান। এই ধনুকে মাত্র চারজন গুণ দিতে সমর্থ—আমি, আর জীবানন্দ, ভবানন্দ ও জ্ঞানানন্দ।' শান্তি অবহেলে ধনুকে গুণ দিলে, সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হলেন। সত্যানন্দ জানলেন শান্তি জীবানন্দের গৃহিণী। তিনি বললেন—'তুমি কেন পাপাচার করতে এসেছ? সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্যে বিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই যে, রমণী জাতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।' শান্তি বলল—'আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি

ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি সহধর্মিণী হিসাবে কেবল ধর্মাচরণের জন্য আসিয়াছি।' তারপর শান্তি আশ্রমের নিকট বনমধ্যে এক পর্ণকুটিরে জীবানন্দের সঙ্গে অবস্থান করতে লাগল। কিন্তু কোনদিন স্বামীর সঙ্গে একাসনে বসল না।

শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ক্যাপ্টেন টমাসের অধীনে ইংরেজের ফৌজ এসে হাজির হল। বনমধ্যে টমাসের সঙ্গে শান্তির দেখা হল। টমাস জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কে?' শান্তি উত্তর দিল 'আমি সন্ন্যাসী'। টমাস বলল—'তুমি **rebel**। আমি তোমায় গুলি করিয়া মারিব।' বিদ্যুদ্‌বেগে শান্তি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিল। শান্তি বলল—'সাহেব আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন?' তারপর ইংরেজের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের যুদ্ধ হল। শান্তিও যুদ্ধে গেল, কিন্তু অলক্ষ্যে রইল। যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য পরাহত হল। সন্তানরা উচ্চনিনাদে গাইল—'বন্দে মাতরম্'।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে শান্তি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে। সে টোলে পড়েছিল, শাস্ত্র অনুশীলন করেছিল, শারীরিক ব্যায়ামে দক্ষতা-লাভ করেছিল। প্রফুল্লর ক্ষেত্রে এসব কিছুই ছিল না। সে সম্পূর্ণ নিরক্ষরা ছিল। বিধবার সে একমাত্র অনিন্দ্যসুন্দরী রূপসী মেয়ে ছিল। তার রূপের জন্যই ভূতপুরের জমিদার হরবল্লভ, তাঁর পুত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার অদৃষ্টে সুখ ছিল না। বড়ঘরে বিবাহ হচ্ছে বলে তার মা যথাযথ মর্যাদা রাখবার জন্য নিজের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করে বিবাহের রাত্রে বরযাত্রীদের যথোচিত সমাদরের সঙ্গে উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু

কন্যাপক্ষীয়দের জন্য ব্যবস্থিত আহারের নিকৃষ্টতা দেখে, কন্যাপক্ষরা তাঁর বাড়িতে সমাগত হয়েও আহার গ্রহণ করল না। প্রফুল্লর মাকে শাস্তি দেবার জন্য তারা পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে, সেখানে রটনা করল যে প্রফুল্লর মা কুলটা।

কিছুকাল পরে প্রফুল্লর মা প্রফুল্লকে নিয়ে হরবল্লভের বাড়ি যায়। হরবল্লভের গৃহিণী প্রথমে তাদের দেখে বিমুখ হলেও, পরে প্রসন্না হয়ে পুত্রবধূকে গ্রহণ করবার জন্য হরবল্লভের কাছে অনুনয়-বিনয় করে। হরবল্লভের পুত্র ব্রজেশ্বরও এ-সম্বন্ধে প্রয়াস করে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই বিফল হয়। হরবল্লভ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। সে কি-ভাবে খাবে, প্রশ্ন করলে, হরবল্লভ প্রফুল্লকে বলে—'চুরি-ডাকাতি করে খাবে'। প্রফুল্ল মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসে। মা অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং কিছুদিন পরে মারা যায়। তার অসহায় অবস্থা দেখে, স্থানীয় জমিদারের নায়েব পরাণ চক্রবর্তী তাকে অপহরণ করে। কিন্তু পথিমধ্যে অন্য লোক দেখে, তাদের ডাকাত ভেবে, ডাকাতের ভয়ে পরাণ ও তার পালকিবাহকরা পালিয়ে যায়। সেই অবসরে প্রফুল্ল পালকি থেকে বেরিয়ে নিকটস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং এক পায়ে-হাঁটা শীর্ণ পথের রেখা ধরে এক ভগ্ন অট্টালিকায় এসে পৌছায়। সেখানে এক বৃদ্ধকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছাখে। মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধের সেবাশুশ্রূষা করে। প্রীত হয়ে বৃদ্ধ তার সঞ্চিত ধনের গুপ্তকক্ষের সন্ধান প্রফুল্লকে দেয়। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর প্রফুল্ল তার শেষকৃত্যাদি সম্পন্ন করে ও মাটির তলার সেই গুপ্তকক্ষ থেকে কুড়ি ঘড়া মোহর ও ধনরত্নাদি পায়।

ধনরত্নাদি পেয়ে প্রফুল্ল ভাবল—'এখন কি করি? কোথায় যাই? এ নিবিড় জঙ্গল ত থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কি প্রকারে? যাই বা কোথায়? বাড়ী ফিরিয়া যাইব? আবার ডাকাইত ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাইব কি

প্রকারে ? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে জানাজানি হইবে, চোর-ডাকাত কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায় ? যাহাকে পাইব, তাহাকেই বা বিশ্বাস কি ? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলা কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ ? এ ধনরাশির লোভ, কে সম্বরণ করিবে ?' এরূপ নানারূপ চিন্তা করে, শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল জঙ্গলে থাকাই সিদ্ধান্ত করল এবং গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হল। কিন্তু হাঁড়ি, কাঠ, চাল-ডাল সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটা মোহর নিয়ে হাটের সন্ধানে বেরুল। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হল। প্রফুল্ল ব্রাহ্মণকে হাটের পথ জিজ্ঞাসা করল। ব্রাহ্মণ বলল—'হাট এক বেলার পথ, তুমি একা যেতে পারবে না।' ব্রাহ্মণ বলল—'এই জঙ্গলে আমার একটা দোকান আছে। তুমি সেখান থেকে চাল-ডাল, হাঁড়ি ইত্যাদি কিনতে পার।' দোকান থেকে চাল-ডাল, হাঁড়ি ইত্যাদি কিনে প্রফুল্ল তাকে একটা মোহর দিল। ব্রাহ্মণ বলল—'মোহর ভাঙ্গিয়ে দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। তুমি পরে দাম দিও, চল তোমার ঘর চিনে আসি।' প্রফুল্ল বলল—'আমার ঘরেও পয়সা নেই, সবই মোহর।' ব্রাহ্মণ বলল—'সবই মোহর ? তা হোক চল তোমার ঘর চিনে আসি।' প্রফুল্লর সন্দেহ হল। ব্রাহ্মণ বুঝল। বলল—'মা, আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করবো না, আমার নাম ভবানী পাঠক, আমি ডাকাইতের সর্দার।' ভবানী পাঠকের নাম প্রফুল্ল নিজগ্রাম দুর্গাপুরেও শুনেছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। প্রফুল্লর বাক্যস্ফূর্তি হল না। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ ঘরের ভিতর হতে একটা দামামা বের করে তাতে গোটাকতক ঘা দিল। মুহূর্তমধ্যে পঞ্চাশ-ষাটজন কালান্তক যমের মতো জওয়ান লাঠি-সড়কি নিয়ে উপস্থিত হল। ভবানী তাদের বলল—'তোমরা এই বালিকাকে চিনে রাখ। আমি এঁকে মা বলেছি। এঁকে তোমরা সকলে মা বলবে, মার মত দেখবে, এঁর কোন অনিষ্ট করবে না, আর কাকেও করতে দেবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।'

এরপর চলল প্রফুল্লর জীবনের ক্রান্তিপর্ব। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়ে প্রফুল্লর পরবর্তী পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হল। প্রফুল্লর সঙ্গে থাকবার জন্য দুজন স্ত্রীলোক দেওয়া হল। একজন গোবরার মা, সে মাত্র হাটবাজার করে। আর একজন নিশি, সে প্রফুল্লর সখীরূপে রইল। প্রফুল্ল নিরক্ষর ছিল। নিশি তাকে বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক শিক্ষা দিল। পরে ভবানী ঠাকুর তাকে ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি পড়ালেন। তারপর সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, যোগশাস্ত্র ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। অশনে-বসনেও প্রফুল্লকে নিয়মানু-বর্তিতার ভিতর দিয়ে চলতে হল। প্রথম বৎসর তার আহার মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা। দ্বিতীয় বৎসরেও তাই। তৃতীয় বৎসরে নুন, লঙ্কা ও ভাত। চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লর প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল, কিন্তু প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মতো খাইল। পরিধানে প্রথম বৎসর চারিখানা কাপড়, দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা, তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে পাট কাপড়, ঢাকাই কলকাদার শান্তিপুরী। প্রফুল্ল সে-সকল ছিঁড়িয়া খাটো করিয়া পরিত। পঞ্চম বৎসর বেশ ইচ্ছামতো। প্রফুল্ল মোটা গড়াই বাহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত। কেশবিন্যাস ও শয়ন সম্বন্ধেও এইরূপ কঠোর বিধানের ভিতর দিয়া প্রফুল্ল তার ধর্ম, কর্ম, সুখ, দুঃখ সবই শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করল। ভবানী ঠাকুর বললেন—'এদেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানে না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি। এ জঙ্গলে ডাকাইতি করে ধর্মাচারে প্রবৃত্ত থাকি।'

প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের অনুগতা শিষ্য হয়ে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হল। নূতন নাম হল দেবী চৌধুরাণী। নিপীড়িত, অত্যাচারিত, দুঃখী

লোকদের কাছে রানীমা নামে পরিচিত হল। দু'হাতে তাদের ধন বিলাতে লাগল।

ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচারে দেশ প্রপীড়িত। একবার হরবল্লভের তালুক হতে টাকা চালান আসছিল। ডাকাতেরা তা লুঠে নিল। সেবার দেবীসিংহের খাজনা দেওয়া হল না। হরবল্লভের দশ হাজার টাকা মুল্যের একখানা তালুক দেবীসিংহ আড়াইশত টাকায় নিজে কিনে নিল। তাতে বাকী খাজনার কিছুই পরিশোধ হল না, দেনার জের চলল। দেবীসিংহের পীড়াপীড়িতে কয়েদের আশঙ্কায় হরবল্লভ আর একটা সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ঋণ পরিশোধ করল। আবার দেবীসিংহের পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকী পড়ল। হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করবার পরওয়ানা বের হল। পুত্র ব্রজেশ্বরের মধ্যমা স্ত্রী সাগরের পিতা ধনীলোক। বাপকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছে গেল। টাকার ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি হল। শ্বশুর রুক্ষভাবে বললেন—'তোমার বাপ বাঁচলে আমার মেয়ের কি? আমার মেয়ের টাকা থাকলে দুঃখ ঘুচবে—শ্বশুর থাকলে দুঃখ ঘুচবে না।' ব্রজেশ্বর রাগ করে চলে যাচ্ছে দেখে শাশুড়ী জামাইকে ডাকলেন। তিনি জামাইকে অনেক বুঝালেন, কিন্তু জামাইয়ের রাগ পড়ল না। তারপর সাগরের পালা, সাগব ব্রজেশ্বরের পায়ে পড়তে গেল। ব্রজেশ্বর তখন রাগে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। পা টানতে গিয়ে সাগরের গায়ে লাগল। সাগর বলল—'তুমি আমায় লাথি মারবে নাকি?' কুপিত ব্রজেশ্বর বলল—'যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড়মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড়মানুষ বাপও এ পা একদিন পূজা করিয়াছিলেন।' সাগর রাগে জ্ঞান হারাল। বলল—'ঝকমারি করেছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব।' ব্রজেশ্বর বলল—'পালটে লাথি মারবে নাকি?' সাগর বলল—'আমি তত অধম নই। কিন্তু আমি যদি বামুনের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—'। এমন সময়

পিছনের জানালা হতে কে বলল—'আমার পা কোলে নিয়ে চাকরের মত টিপে দিবে।' ব্রজেশ্বর চলে গেল। পিছনের জানালা হতে যে কথা বলেছিল, সে এখন ঘরে প্রবেশ করল। সাগর জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কে?' স্ত্রীলোক উত্তর দিল—'আমি দেবী চৌধুরাণী'। নাম শুনে সাগর প্রথম ভয় পেল। কিন্তু পরমুহূর্তে প্রফুল্লকে চিনতে পারল। প্রফুল্ল সাগরকে নিজ বজরায় নিয়ে গেল।

দেবী চৌধুরাণী নিজ বজরায় ফিরে এসে অনুচর রঙ্গরাজকে আদেশ দিল ব্রজেশ্বরকে বজরায় ধরে নিয়ে আসতে। আদেশমতো ব্রজেশ্বরকে বজরায় ধরে নিয়ে আসা হল। পর্দার আড়াল থেকে দেবীর সঙ্গে তার কথা হল। ব্রজেশ্বর মুক্তিপণ জানতে চাইল। উত্তর—'এক কড়া কানা-কড়ি'। ব্রজেশ্বর কানাকড়ি দিতে পারল না। তখন কামরার ভিতরে আর-এক স্ত্রীলোক বলল—'রানীজি, যদি এক কড়া কানাকড়িই এই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কানাকড়ি দিচ্ছি। আমার কাছে ওকে বিক্রয় করুন।' ব্রজেশ্বর ভিতরে প্রবেশ করে দেখল, যে স্ত্রীলোক তাকে কিনল সে মসনদের ওপর শুয়ে আছে—তার মুখের ওপর একখানা বড় মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা। তার আদেশমতো ব্রজেশ্বর তার পা টিপতে লাগল। তারপর রুমালখানা সরাবার পর ব্রজেশ্বর দেখল সে-স্ত্রীলোক আর কেউই নয়, সাগর। সাগরের প্রতিজ্ঞারক্ষা হল। ব্রজেশ্বর বিস্মিত হল। সাগর বলল—'দেবী চৌধুরাণী তার সম্পর্কিত বোন।' তারপর ব্রজেশ্বরকে দেবী চৌধুরাণীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ব্রজেশ্বর আবার বিস্মিত হল। প্রফুল্লর সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করল। দেবী ব্রজেশ্বরকে এক কলসী মোহর দিল, যার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর। দেবী বলল—'টাকা আমার নয়, টাকা দেবতার, দেবত্র সম্পত্তি থেকে এ টাকা আপনাকে কর্জ দিচ্ছি।' দেবী বলল—'আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটে টাকা আনবেন।' দেবী উপহারস্বরূপ ব্রজেশ্বরকে একটা

আংটি দিল। ফেরবার পথে ব্রজেশ্বর আংটি পরীক্ষা করে দেখল 'এ আংটি, তারই আংটি, প্রফুল্লকে সে-ই এই আংটি দিয়েছিল'। আংটিটা তার অভিজ্ঞান বা 'আইডেন্টিটি'র সূত্র হয়ে দাঁড়াল। ব্রজেশ্বরের মারফত টাকা পেয়ে হরবল্লভ খুশী হল। কিন্তু টাকা শোধ করবার উদ্যোগ করল না। ভাবল—'বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীতে যদি দেবীকে ধরিয়ে দিতে পারি, তা হলে টাকাও শোধ করতে হবে না, বরং ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে।' সেরূপই উদ্যোগ করল। পিতা ঋণ পরিশোধের কোনরূপ উদ্যোগ করছেন না দেখে, নির্দিষ্ট দিনে ব্রজেশ্বর আরও কিছু সময় প্রার্থনার জন্য দেবীর বজরায় এসে হাজির হল। এদিকে হরবল্লভের কথামতো ইংরেজরা বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীতে দেবীকে ধরবার জন্য পাঁচশত সিপাহী সমেত লেফটানেণ্ট ব্রেনানকে পাঠিয়ে দিল। দেবী প্রথমে নিজেকে ধরা দেওয়াই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। নিজের দলের সমস্ত লোককে তিনি বিদায় দিলেন। 'একটা মেয়ে মানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মরিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্মজ্ঞান নাই? আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য এত লোক মরিবে কেন? আমায় কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব।' কিন্তু ঘটনা-চক্রে ও ভগবানের ইচ্ছায় কালবৈশাখীর ঝড় উঠে দেবীর সব সিদ্ধান্ত ওলটপালট করে দিল। ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দেবীর মরা হল না। দেবী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে আবার নিজ শ্বশুরবাড়িতে 'নতুন বৌ' হিসাবে ফিরে এল।

উপসংহারে বঙ্কিম বলেছেন—'রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি দেবীগড়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ ভোজনে জীবন নির্বাহ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। ভবানী ঠাকুরের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিল না। ইংরেজ রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী

ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিলেন। তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিলেন— আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস। ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল। প্রফুল্লকে সম্বোধন করে বঙ্কিম বলেছেন : "একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র ; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' ॥"

শ্রী ভূষণার জমিদার সীতারাম রায়ের স্ত্রী। বিবাহের দু-চারদিন পরে সে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছিল, কেননা তার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের পর প্রকাশ পেয়েছিল যে-তার কোষ্ঠীতে বলবান চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থেকে শনির ত্রিংশাংশগত হয়েছিল, যার ফলে সে প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হবে। স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে তাকে মাতৃ-আলয়েই ফিরে আসতে হয়েছিল। মাতৃ-আলয়ে বিধবা মা, সে ও ভাই গঙ্গারাম। মার অন্তিম-কালে গঙ্গারাম রাত্রিকালে বেরিয়েছেন কবিরাজ ডাকতে। সরু পথের ওপর আড়াআড়িভাবে এক ফকির শুয়ে ছিল। গঙ্গারামের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে যখন তাকে পথ দিল না, গঙ্গারাম তখন তাকে ডিঙিয়ে যেতে গিয়ে তার গায়ে নিজের পা ঠেকিয়ে ফেলে। ফকির কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করে। কাজী গঙ্গারামকে জীবন্ত কবর দেবার আদেশ দেয়। পরদিন মায়ের সংকার করে গঙ্গারাম যখন বাড়ি ফির-ছিল, ফৌজদারের পেয়াদা এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়। শ্রী এই বিপদে বহুকাল পরে সীতারামের কাছে যায় ও গঙ্গারামকে রক্ষা

করবার প্রার্থনা জানায়। বহুদিন পরে শ্রীকে দেখে সীতারামের মন টলে। সীতারাম গঙ্গারামকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরদিন গঙ্গারামকে জীবন্ত কবর দেবার জন্য যথাস্থানে নিয়ে আসা হয়। জীবন্ত মানুষের কবর দেখবার জন্য লোকে লোকারণ্য হয়। এদিকে শ্রীকে প্রতিশ্রুতি দেবার পর সীতারাম গঙ্গারামকে বাঁচাবার জন্য তার গুরুদেব চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার ও বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে। যেখানে কবর দেওয়া হয়, সেখানে এক গাছের উপর উঠে বসলেন চন্দ্রচূড় ও নিচে গাছের দুই শাখার উপর দাঁড়িয়ে রইল লাল শাড়ি পরা শ্রী। কবর দেওয়ার জন্য যেখানে মাটি খোঁড়া হয়েছিল, সেখানে গঙ্গারামকে কবরের মধ্যে ফেলবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে এসে উপস্থিত হল অশ্বারোহণে সীতারাম। অশ্ব থেকে অবরোহণ করে সীতারাম কাজী ও ফকিরের কাছে ছুটে গেল। প্রার্থনা করল, যে-কোন মূল্যে, এমনকি তার নিজের প্রাণের পরিবর্তে গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা। কিন্তু প্রার্থনা মঞ্জুর হল না। এমন সময় কামার (যে রাত্রিশেষে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কাছ থেকে কিছু টাকা খেয়েছিল) কাজী সাহেবকে বলল—'আজকাল ভাল লোহা পাওয়া যাচ্ছে না; রাজ্যে দুষ্কৃতকারীদের সংখ্যা বাড়ছে, আমি আর হাতকড়া ও পায়ের বেড়ি যোগাতে পারছি না। যদি হুকুম দেন তো কয়েদীকে কবরে গাড়বার আগে হাতকড়া ও পায়ের বেড়ি খুলে নিই; সরকারী হাতকড়া ও বেড়ির লোকসান হবে কেন?' হাতকড়া ও বেড়ি খুলে নেবার হুকুম হল। মুক্ত হয়ে গঙ্গারাম একবার এদিক-ওদিক চাইল। তারপর চকিতের মধ্যে সীতারামের হাত হতে চাবুক কেড়ে নিয়ে, একলাফে সীতারামের ঘোড়ায় চেপে সেই জনারণ্য থেকে বেরিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেল। সিপাহীরা তার পিছনে ছুটতে গেল। কিন্তু কালান্তক যমের মতো কতকগুলি বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী হিন্দু এসে তাদের পথরোধ করল। হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর দাঙ্গা লাগল। এমন সময় হিন্দুরা দেখল গাছের

উপর লাল শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে চণ্ডীর মতো এক দেবী শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে বলছেন—'মার, মার'। সকলেই বলল 'চণ্ডী এসেছেন, চণ্ডীর হুকুম মার, মার, মার, জয় চণ্ডিকে'। নিমেষের মধ্যে হিন্দুদের জয় হল, মুসলমানরা পালাল, ফকিরের মুণ্ডচ্ছেদ হল। বিদ্রোহদমনার্থ ফৌজদার কামান গোলাগুলি নিয়ে আসছে শুনে, লোকেরা সব সরে পড়ল। সীতারাম শ্রীকে নিয়ে, গঙ্গারাম যেখানে ছিল সেখানে এসে গঙ্গারামকে বলল, 'তুমি বড় নদী পার হয়ে ভূষণার বাইরে আমার জমিদারী শ্যামপুরে চলে যাও। আমি তোমার ভগিনীকে নিয়ে সেখানে যাচ্ছি।' পথিমধ্যে শ্রী বলল—'আমি কুলটা নই, জাতিভ্রষ্টাও নই, তোমার সহধর্মিণী, তুমি যখন আমাকে ত্যাগ করেছ, তখন আমি তোমার সঙ্গে যাব না।' শ্রী অন্তর্হিতা হয়ে গেল। শ্রী শ্রীক্ষেত্রের পথ ধরল। পথে বৈতরণীতীরে তার সমবয়স্কা এক অপরূপ লাবণ্যময়ী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা হল। নাম তার জয়ন্তী। জয়ন্তীর প্রভাবে শ্রীও সন্ন্যাসিনী হল। এদিকে সীতারাম শ্যামপুরে এসে এক নগর নির্মাণ করল। সেখানে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করল। ভূষণা এবং নিকটস্থ অঞ্চলের হিন্দুরা সেখানে এসে বসবাস ও দোকানপাট স্থাপন করল। মুসলমানদের রোষ এড়াবার জন্য সীতারাম নগরের নাম দিল মহম্মদপুর। গঙ্গারামকে সে কোতোয়াল নিযুক্ত করল, আর মৃন্ময় নামে এক ব্যক্তিকে সৈন্যাধ্যক্ষ করল। দিন দিন সীতারামের রাজ্য বাড়তে লাগল। সীতারাম চিন্তা করল দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি না পেলে, তার রাজ্যের স্বীকৃতি নেই। সেই কারণে সীতারাম দিল্লি যাত্রা করল। শ্রীকে পরিত্যাগের পর সীতারাম আরও দুই বিবাহ করেছিল,—রানী নন্দা ও রানী রমা। সীতারামের দিল্লীযাত্রার অনুপস্থিতিতে গঙ্গারাম কনিষ্ঠা রানী রমার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে পাবার জন্য দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হল। এদিকে সীতারামের অনুপস্থিতিতে মুসলমানরা সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করবার

পরিকল্পনা করল। রমাকে পাবার জন্য গঙ্গারাম বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। স্থির হল গঙ্গারাম এমন ব্যবস্থা করবে যাতে মুসলমানরা বিনা প্রতিরোধে সীতারামের রাজ্য জয় করতে পারে এবং পুরস্কারস্বরূপ পাবে রমাকে। আক্রমণের আগের দিন মহম্মদপুরে আবির্ভূতা হল ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীবেশে শ্রী ও জয়ন্তী। জয়ন্তী গঙ্গারামের কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হল। গঙ্গারাম তাকে দেবী ভেবে ভয় পেয়ে গেল। জয়ন্তীর নির্দেশমতো তাকে দিল কিছু কামান, গোলাবারুদ ও একজন দক্ষ গোলন্দাজ। এদিকে মৃন্ময়কে বলল যে মুসলমানরা দক্ষিণের পথে আক্রমণ করতে আসছে। মৃন্ময় সৈন্য নিয়ে, নগর অরক্ষিত রেখে, সেইদিকে রওনা হল। কিন্তু গঙ্গারামের পরামর্শ অনুযায়ী মুসলমানরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে উত্তরদিকে ঠিক নগরের বিপরীত তীরের ঘাটে হাজির হয়। নৌকাযোগে মুসলমান সিপাহীরা নদী পার হতে শুরু করে। হঠাৎ নদীর এপার থেকে আওয়াজ হল 'গুড়ুম'। আবার 'গুড়ুম', আবার 'গুড়ুম'। নদীবক্ষে সিপাহী-বোঝাই নৌকাসমূহ ধ্বংস হল। মুসলমান সৈন্য পালাল। হিন্দুদের জয়জয়কার। বলা বাহুল্য, গোলা বারুদ কামান সবই জয়ন্তী কর্তৃক পূর্বরাত্রে গঙ্গারামের কাছ থেকে সংগৃহীত, আর গোলন্দাজ স্বয়ং সীতারাম। দিল্লী থেকে ফিরে আসা-মাত্রই নদীর ঘাটে জয়ন্তীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। সীতারাম নিজ রাজ্যে ফিরে এসে প্রথমেই গঙ্গারামকে বন্দী করেন। এদিকে দেশের মধ্যে গঙ্গারাম ও ছোট রানীকে নিয়ে নানারকম রটনা হতে থাকে। নিরপরাধিনী রমা প্রাণত্যাগ করতে চাইল। নন্দার অনুরোধে সীতারাম বিচার আহ্বান করলেন। অনেকেই গঙ্গারামের বিপক্ষে এবং রমা যে নিরপরাধিনী সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। রমাও প্রকাশ্য দরবারে এসে সাক্ষ্য দিল। গঙ্গারাম সকলের সাক্ষী অস্বীকার করল। সভায় জয়ন্তীর আবির্ভাব ঘটল। জয়ন্তী এসে গঙ্গারামের বুকে ত্রিশূল রেখে,

তাকে সত্য কথা বলতে বলল। গঙ্গারাম জয়ন্তীকে দেবী ভেবে সত্য কথা বলল। গঙ্গারামকে শূলে দেবার আদেশ হল। কিন্তু জয়ন্তী সীতারামের কাছে তার প্রাণভিক্ষা চাইল। জয়ন্তীকে রাজলক্ষ্মী ভেবে সীতারাম বললেন—'শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী আমার জীবনস্বরূপ। আপনি দেবী, সব দিতে পারেন। আমার জীবন আমায় দিয়া, সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন ফিরিয়া লউন।' জয়ন্তী বলল—'মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুর-দ্বার সকল মুক্ত রাখিবেন, আর অন্তঃপুরের প্রহরীদিগকে আজ্ঞা দিবেন, ত্রিশূল দেখিলে যেন পথ ছাড়িয়া দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রিতেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হউক।' গঙ্গারাম মুক্তি পায়, এবং তৎক্ষণাৎ রাজ্য ত্যাগ করে।

তারপর রাত্রে সীতারামের শয্যাগৃহে শ্রীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু এ তো সে শ্রী নয়। যে শ্রীকে সীতারাম চেয়েছিল, এ সে নয়। এ সন্ন্যাসিনী শ্রী। সীতারাম বললেন—'এখন তুমি আমার মহিষী হইয়া রাজপুরী আলো কর।' শ্রী উত্তর দিল—'মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনিয়াছি। তোমার সৌভাগ্য যে তুমি তেমন মহিষী পাইয়াছ। অন্য মহিষীর কামনা করিও না। যেদিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সেদিন গিয়াছে। আমি সন্ন্যাসিনী; সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়াছি।' রাজা বললেন—'তোমাকে দেখিলেই আমি সুখী হইব।' শ্রী বলল—'তুমি স্বামী, তুমি রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য। তবে আমাকে রাজপুরী মধ্যে স্থান না দিয়া আমাকে একটু পৃথক কুটির তৈয়ার করিয়া দিবেন।' শ্রী কিছুতেই রাজপুরী-মধ্যে থাকতে রাজী হল না। তখন 'সীতারাম 'চিত্তবিশ্রাম' নামে এক ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রমোদভবন শ্রীর নিবাসার্থ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিল। রাজা প্রত্যহ তাহার সাক্ষাৎ জন্য যাইতেন। পৃথক আসনে বসিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন।' প্রথমে

প্রহরেক থেকে চলে আসতেন, তারপর ক্রমশ রাত্রি বেশী হতে লাগল। তারপর চিত্তবিশ্রামেই নিজের সায়াহ্ন আহার এবং রাত্রিতে পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করলেন। রাজকার্যে অমনোযোগী হলেন। রাজ-কর্মচারীরা চুরি করে রাজ্য দেউলিয়া করে দিল। এদিকে রাজা কর্তৃক অবহেলিত হয়ে রমার মৃত্যু ঘটল।

সন্ন্যাসিনী যে রাজার প্রথমা স্ত্রী শ্রী, তা কেউই জানল না। রাজ্যময় রটনা হল যে, সে রাজার উপপত্নী। কেউ বলল ডাকিনী, রাজাকে বশ করে রেখেছে।

রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পেল। রাজ্য যায়-যায় অবস্থা। এমন সময় জয়ন্তী এসে শ্রীকে অন্যত্র সরিয়ে দিল। রাজা শ্রীকে না পেয়ে, জয়ন্তীকে বন্দী করলেন। ক্রুদ্ধ রাজা তাকে বিবসনা করে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। নন্দা ও অন্যান্য পুরনারীরা এসে জয়ন্তীকে ঘিরে দাঁড়াল। নন্দা বলল –'মহারাজ! আমি পতি-পুত্রবতী। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে কখনও এ পাপ করিতে দিব না। তাহা হইলে আমার কেহ থাকিবে না।'

প্রজারা রাজাকে ধিক্কার দিয়ে মহম্মদপুর ত্যাগ করতে লাগল। এসব খবর পেয়ে মুসলমানরা সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করল। সেনাপতি মৃন্ময় মুসলমান সেনার হাতে নিহত হল। মুসলমানের লক্ষ্য যোদ্ধা। সীতারামের তখন একশতও নাই। সকলেই পলাতক। গত্যন্তর না দেখে সীতারাম সর্বাঙ্গে অস্ত্রদ্বারা শোভিত হয়ে বীরদর্পে মৃত্যুকামনায় একাকী দুর্গদ্বারাভিমুখে চললো। দুর্গদ্বারে গিয়ে দেখলেন, যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতের জন্য আরূঢ় করেছিলেন, সেই বেদীতে কে বসে আছে। দেখলেন ত্রিশূল হস্তে গৈরিকভস্মরুদ্রাক্ষবিভূষিতা ভৈরবী-বেশে জয়ন্তী ও শ্রী। মঞ্চ হতে শ্রী নেমে সীতারামের চরণের ওপর পড়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল—'এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমাকে আবার

গ্রহণ কর।' সীতারাম বললেন—'তুমিই আমার মহিষী।' জয়ন্তী বলল —'আজ থেকে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হউন।' সীতারাম জয়ন্তীকে বললেন—'মা, আমি তোমার কাছে অপরাধী, আমি বুঝেছি তুমি যথার্থ দেবী। আমায় বল তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করলে তুমি প্রসন্ন হও। ওই শোন মুসলমানের কামানের গর্জন। আমি ওই কামানের মুখে এখনই এই দেহ সমর্পণ করব। আর সময় নেই। তুমি বল কি করলে তুমি প্রসন্ন হও।' শ্রী বললো—'মহারাজ! আমি বা নন্দা মরতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা ও রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাদের রক্ষার কিছু উপায় করুন।' সীতারাম বললেন—'আমি নিরুপায়।' জয়ন্তী বলল—'মহারাজ, নিরুপায়ের এক উপায় আছে। আপনি ঐশ্বর্যমদে নিরুপায়ের সেই উপায়কে ভুলে গেছেন।' সীতারাম তখন নিরুপায়ের সেই উপায় 'ঈশ্বর' চিন্তা করলেন। জয়ন্তী ও শ্রী মঞ্চের ওপর জানু পেতে সেই মহাদুর্গের চারদিক প্রতিধ্বনিত করে গগনবিদারী কলবিহঙ্গনিন্দী কণ্ঠে গেয়ে উঠল—'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥' যে ক'জন যোদ্ধা দুর্গমধ্যে ছিল, তারা সেই গীত শুনে অনুপ্রাণিত হল। তাদের সঙ্গে মহারাজ অগ্রসর হয়ে দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। সম্মুখেই ত্রিশূলধারিণী গৈরিকভস্মরুদ্রাক্ষবিভূষিতা জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখে শত্রুসৈন্য মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্চল হয়ে গেল। শ্রী ও জয়ন্তী দ্রুতপদে এসে কামানের সামনে দাঁড়াল। হকচকিয়ে গোলন্দাজের হাত থেকে পলতে পড়ে গেল। সে কামান থেকে সরে দাঁড়াল। সীতারাম একলম্ফে এসে তার মাথা কেটে ফেললেন। দেখা গেল গোলন্দাজ আর কেউই নয়, স্বয়ং গঙ্গারাম। শ্রী সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হল। এইভাবে বিধিলিপি ফলল। জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে দেখা করল না। সেই রাত্রে তারা কোথায় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কেউ জানল না।

ꕥꕥꕥ

‘পথের দাবী’তে ঘটনা অপেক্ষা সংলাপের বাহুল্যই বেশি। সংলাপ সবই ‘বিপ্লব’ সম্পর্কিত। অপূর্ব বাঙলাদেশের ছেলে। চাকরির সন্ধানে ব্রহ্মদেশে গিয়ে যে বাসায় আশ্রয় নিয়েছে, তার ওপরতলার বাসিন্দা এক ক্রীশ্চান পরিবারের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। ঝগড়া আদালত পর্যন্ত গড়ায়। অপূর্ব নিগৃহীত হয়। কিন্তু পরে ওই পরিবারের মেয়ে ভারতী তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। অপূর্ব পাঁচশত টাকা মাহিনায় বোথা কোম্পানীর ম্যানেজার নিযুক্ত হয়। ভারতীর মাধ্যমে অপূর্ব বিপ্লবী ‘পথের দাবী’ দলের সভানেত্রী সুমিত্রার সংস্পর্শে আসে। সুমিত্রার পিতা ছিলেন একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ, সুরভায়া রেল স্টেশনে চাকরি করতেন। মা ছিলেন একজন ইহুদী মহিলা। সুমিত্রার শিক্ষাদীক্ষা সবই মিশনারী স্কুলে। সুমিত্রা অসামান্যা সুন্দরী। পিতার মৃত্যুর পর চোরা অহিফেন কারবারীদের প্রভাবে পড়ে। তারা সুমিত্রাকে নিযুক্ত করে রেলপথে অহিফেনের পেটিকা এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় স্থানান্তরিত করত। একবার এক রেল-স্টেশনে সে অহিফেনের পেটিকা সমেত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সেখানে পথের দাবী দলের নেতা সব্যসাচী সুমিত্রাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে ও ওই অহিফেন-পেটিকার স্বত্ব অস্বীকার করে। সুমিত্রা মুক্তি পায়। কিন্তু অহিফেনের চোরা কারবারীদের দল তাদের পিছন নেয়। এক হোটেলের ওপরতলার ঘরে অবস্থান করছিল সুমিত্রা, আর নীচের তলার ঘরে সব্যসাচী। সেখানে চোরাকারবারী দলের আট-দশজন দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক এসে সুমিত্রাকে স্ত্রী বলে দাবী করে। সুমিত্রা তাদের অস্বীকার করে। পরদিন রাত্রে তারা সুমিত্রাকে বলপূর্বক অপহরণ করতে আসে। কিন্তু সব্যসাচীর গুলিতে তারা আহত ও দু-একজন নিহত হয়। সব্যসাচী বেপরোয়া নির্ভীক বিপ্লবী। সে বহুরূপী। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সে জাপান থেকে জাভা পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লবী

দল গঠন করে। সুমিত্রাকে চোরাচালানীরা সহজে ছাড়বে না এবং প্রতিশোধ নেবে এই চিন্তা করে সব্যসাচী তাকে ব্রহ্মদেশে নিয়ে আসে এবং সেখানে দল গঠনের কাজে তাকে নিযুক্ত করে। ভারতীকে সে সহায় পায় এবং তাকে নিয়ে সে ব্রহ্মদেশের কলকারখানার মজুরদের নিয়ে দল গঠন করবার সঙ্কল্প করে। কলকারখানার শোষিত মজুরদের দীন-হীন অবস্থা ও পশুর মতো জীবনযাত্রা তাদের সহায়ক হয়। ভারতীর মাধ্যমে অপূর্বও পথের দাবী দলে যোগ দেয়। দলের প্রথম দিনের সভায় অপূর্বই হয় প্রধান বক্তা। জনসভায় অপূর্ব কখনও এর আগে বক্তৃতা দেয়নি। কিন্তু প্রথম দিনের সাফল্য সম্বন্ধে সুমিত্রার কাছ থেকে প্রশংসাসূচক চিঠি পেয়ে, সে দ্বিতীয় দিনের সভার বক্তৃতার মহড়া দিতে থাকে তার অফিসে। এটা লক্ষ্য করে অফিসে তার প্রিয় বন্ধু চীফ অ্যাকাউন্টটেণ্ট রামদাস তালওয়ার। অপূর্ব তাকে সব কথা বলে। তখন সে জানল যে তালওয়ারও একজন পাকা বিপ্লবী। ভারতে সে জেলও খেটেছে। তালওয়ার এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়। রাজদ্রোহের অপরাধে সে গ্রেপ্তার হয়। নিজের চাকরির নিরাপত্তার জন্য অপূর্ব পুলিশের কাছে পথের দাবী দল সম্বন্ধে সব কথা বলে। পথের দাবীর দল তাই জেনে অপূর্বকে ধরে নিয়ে যায় তার বিচারের জন্য। ভারতীকে সেখানে ডেকে পাঠানো হয়। ভারতী সেখানে গিয়ে দেখে যে বিচারকমণ্ডলীর সভানেত্রী সুমিত্রা। সব্যসাচীও সেখানে উপস্থিত। আরও উপস্থিত ব্রজেন্দ্র নামে একজন কুৎসিত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। বিচারে রায় দেওয়া হয় 'ডেথ'। ব্রজেন্দ্র অপূর্বকে মেরে এক পুরাতন কূপের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ভারতীর সজলনয়নের দিকে তাকিয়ে সব্যসাচীর মন টলে। পিস্তল দেখিয়ে সে দুর্ধর্ষ ব্রজেন্দ্রকে নিরস্ত করে। অপূর্বকে মুক্তি দেয়, এবং তিনদিনের মধ্যে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে নিজের দেশে ফিরে যেতে আদেশ দেয়। দেশে ফিরে অপূর্ব দেখে মা অন্তিমশয্যায়

শায়িত, ও অন্য পুত্রগণ কর্তৃক অবহেলিত। মাকে নিয়ে অপূর্ব আবার ব্রহ্মদেশে ফিরে যায়। ভারতীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু অপূর্বর আচরণে ভারতী তখনও ক্ষুব্ধ। সে অপূর্বর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃত হয়। কিন্তু বিকালে সে যখন দাসীর মুখে অপূর্বর মায়ের মৃত্যুসংবাদ পায়, তখন সে নিজেই ছুটে যায় অপূর্বর বাসায়। অপূর্বকে সে নিজ বাসায় নিয়ে আসে।

এর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ভারতীর মন ভরে গিয়েছিল পরিপূর্ণ ঘৃণায় যখন সে শুনল যে দলের সদস্যা নবতারা স্বামীর মৃত্যুর সাতদিন পরে আবার বিয়ে করছে দলের কবি শশীকে। শশী বিয়েতে তাদের নিমন্ত্রণ করল। বিয়ের দিন সব্যসাচী ভারতীকে নিয়ে শশীর বাড়ি গেল। গিয়ে শুনল নবতারা সেদিন দুপুরে আহমেদ নামে কলের এক মিস্ত্রিকে বিয়ে করেছে। ভারতী আরও বিমর্ষ হয়ে পড়ল। সহসা সেখানে এল সুমিত্রা ও ব্রজেন্দ্র। সুমিত্রা জানাল যে সে তার মাতামহের এক বিরাট সম্পত্তি পেয়েছে এবং সেই কারণে সুরভায়ায় ফিরে যাচ্ছে। এদিকে ব্রজেন্দ্র সব্যসাচীকে সরিয়ে দিতে চায়, সুমিত্রাকে পাবার জন্য।

এর কয়েকদিন আগে থেকেই সব্যসাচী ভারতীকে বোঝাচ্ছিল, এ বিপ্লবের পথে ভারতীর আর থাকা উচিত নয়। ভারতীও রক্তপাতের ভিতর দিয়ে বিপ্লবের উদ্দেশ্যসাধন চাইছিল না। এখন সুমিত্রার সুরভায়ায় ফিরে যাবার সঙ্কল্পে পথের দাবীর দল ভেঙে পড়ল। সুমিত্রা গেল, ভারতী গেল, নবতারা গেল, তালওয়ার জেলে গেল; রইল শুধু সব্যসাচী। এদিকে ব্রজেন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করে দলের অন্যান্য যে-সব শাখা ছিল সেগুলি পুলিশকে জানিয়ে দিল। সব্যসাচী পায়ে-হাঁটা পথে চীনে যাবে ঘোষণা করেছিল। সেজন্য ব্রজেন্দ্র সে-পথে ওৎ পেতে রইল সব্যসাচীকে ধরিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু সব্যসাচী তা জানতে পেরে স্টীমারে করে জাভা চলে গেল।

ঌঌঌ

হিন্দিতে একটা বচন আছে : 'গাগরী মে সাগর ভর দিয়া গয়া হায়'। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' তাই। এখানা দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। এর কেন্দ্র-চরিত্র হচ্ছে এলা। এলা অপূর্ব-সুন্দরী। বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে এলার ছেলেবেলাটা কেটেছিল। মা ছিলেন বেহিসাবী মেজাজের লোক। কারণে-অকারণে মেয়ের দোষ ধরতেন। বলতেন, 'তুই মিছে কথা বলছিস'। অথচ অবিমিশ্র সত্যকথা বলাই এলার একটা ব্যসন-বিশেষ ছিল। বাবা ছিলেন বিলাত-শিক্ষিত সাইকোলজির অধ্যাপক। তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তির জন্য তাঁর ছিল সুনাম। কিন্তু সাংসারিক বিচারবুদ্ধি ছিল তাঁর কম। ভুল করে লোককে বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস করে নিজের ক্ষতি করার বারবার অভিজ্ঞতাতেও তাঁর শোধন হয়নি। বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যগুণে তার বাপকে কেবলই ঠকতে ও দুঃখ পেতে দেখে বাপের ওপর এলার ছিল ব্যথিত স্নেহ। নানা উপলক্ষে মায়ের কাছে বাবার অসম্মান দেখে এলা চোখের জলে রাত্রে তার বালিশ ভিজিয়ে ফেলত। একদিন এলা বাবাকে বলেছিল—'এরকম অন্যায় চুপ করে সহ্য করাই অন্যায়।' পিতা পুত্রীকে উত্তর দিয়েছিলেন—'স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা, আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াও তাই।'

পিতা দেখলেন এইসব পারিবারিক দ্বন্দ্বে মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে কলকাতার বোর্ডিঙে যেতে চাইল। বাবা পাঠিয়ে দিলেন। এলা স্কুল-কলেজের সব পরীক্ষায় পাস করল। ইতিমধ্যে মা-বাবা দু'জনেই মারা গেলেন। কাকা ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর ওপরই পড়ল এলার ভার। কাকীমা এলাকে ভাল চোখে দেখলেন না। একদিন সেখানে নিমন্ত্রণে এল ইন্দ্রনাথ। দেশের ছাত্রসমাজের উপর ছিল তার অসীম আধিপত্য। এলা তাকে একটা কাজের কথা বলল। ইন্দ্রনাথ বলল—'কলকাতায় সম্প্রতি নারায়ণী হাইস্কুল মেয়েদের

জন্য খোলা হচ্ছে। তোমাকে তার কর্ত্রীপদ দিতে পারি। কিন্তু সংসারের বন্ধনে কোনদিন বদ্ধ হবে না, এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে।' এলা রাজী হয়ে গেল।

নারায়ণী বিদ্যালয়ে এসে এলা পড়ল স্বদেশসেবার গোপন সাধনার আবর্তে। অনেক তরুণ ও তরুণীর সংস্পর্শে এল। আদর্শ ও প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ওদের কর্মপ্রয়াস চলতে লাগল। তারপর ওদের দলে এল অতীন্দ্র। অতীন্দ্রকে এলা ভালবেসে ফেলল। প্রতিদ্বন্দ্বী জুটল বটু। ঈর্ষায় বটু অতীন্দ্রের নানারকম অনিষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগল। শেষকালে করল বিশ্বাসঘাতকতা। অতীন্দ্রের দল একজায়গায় লুঠ করে আনল এক বুড়ির যথাসর্বস্ব। বুড়ি দলের একজনকে চিনতে পারায়, ওরা বুড়ির প্রাণান্ত করল। বটু পুলিশের কাছে সব ফাঁস করে দিল। ভোর রাতে পুলিশ আসবে অতীন্দ্রকে ধরতে। শেষরাত্রে অতীন এল এলার ঘরে। এলা অতীন্দ্রের পা জড়িয়ে ধরে বলল—'মারো, আমাকে অন্তু নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।' অতীনকে বার বার চুমু খেয়ে বলল—'মারো, এইবার মারো।' ছিঁড়ে ফেলল বুকের জামা। বলল—'একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণ তোমার—মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগাতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।'

ꕥ ꕥ ꕥ

যদিও পাঁচখানা উপন্যাসই বীররসে সিক্ত, তা হলেও তাদের রচয়িতারা ছিলেন আদিরসের মহাকবি। বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সকলেই। বস্তুত আদিরসের মৈনাকভিত্তিক শৈলস্তম্ভে ধাক্কা খেয়েই বিপ্লবসমূহ ধ্বসে পড়েছিল।

শান্তি ও এলা যথাক্রমে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের অনুপম সৃজন! দু'জনেই আশৈশব বিদ্রোহী; শান্তি অদৃষ্টবিপাকে, আর এলা পারি-

বারিক পরিবেশের প্রতিঘাতে। প্রফুল্ল ও শ্রী ভবিতব্যের শিকার। ভবিতব্য তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিপ্লবের আবহের মধ্যে। সুমিত্রা ঘটনাপ্রবাহের অগ্নিবাহিকা। এদের সকলের চরিত্রেই লক্ষ্য করা যায় বীররস ও আদিরসের অপূর্ব সম্মিলন। বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহে এই দুই রসের যুগল ধারা গঙ্গা-যমুনার মিলিত ধারার মতো পরম সৌখ্যতার বেণীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুললিত গতিতে প্রবাহিত। সুমিত্রার চরিত্রে আদিরসের ধারা স্তিমিত, কিন্তু এলার চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত। আবার শান্তির চরিত্র কৌতুকরসেরও পয়ঃকুম্ভ। এর নিদর্শন আমরা পাই বনমধ্যে ক্যাপ্টেন টমাসের সঙ্গে তার কথোপকথনে ও আশ্রম-মধ্যে জীবানন্দের ঘরে জীবানন্দের সঙ্গে তার সংলাপে। কৌতুকরসের অবতারণায় প্রফুল্লর ভূমিকাও কম নয়। এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই বজরার মধ্যে যখন ব্রজেশ্বরকে ধরে এনে সাগরের পা টেপানো হয়েছিল বা লেফটানেণ্ট ব্রেনান ও হরবল্লভকে ধরে এনে তাদের সঙ্গে প্রফুল্লর ইঙ্গিতে দিবা ও নিশার কৌতুকপূর্ণ তামাসায়। এসব নাটকীয় দৃশ্য রোমান্সের বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হয়ে স্নিগ্ধ কমেডি-রসের সৃষ্টি করেছে।

নায়িকারা সকলেই অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার মূর্তিময়ী প্রতীক। শান্তি এক লহমায় বিদ্যুদ্‌বেগে কেড়ে নেয় ক্যাপ্টেন টমাসের বন্দুক ও বিনা ক্লেশে ইস্পাতের ধনুকে লোহার গুণ পরায়। দেবী চৌধুরানীর বীরত্ব ও সাহসিকতায় ইংরেজ সন্ত্রস্ত। শ্রী বৃক্ষশাখায় আরোহণ করে লাল শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে উৎসাহ দেয় হিন্দু জনতাকে ম্লেচ্ছনিধনে, ও শেষ যুদ্ধে কামানের মুখে দাঁড়িয়ে। সুমিত্রা ও এলারও সাহসের অন্ত নেই। বীরাঙ্গনা হলেও এরা সকলেই ছিল বাঙালী ঘরের কুলাঙ্গনা। এমনকি পথের দাবীর আনুষঙ্গিক চরিত্র ভারতী বিজাতীয় ক্রীশ্চান সমাজভুক্ত হলেও আমরা তাকে দেখি বাঙালী ঘরের চিরপরিচিতা মেয়েরূপে। বাঙালী কুলাঙ্গনা বলেই শান্তি, প্রফুল্ল ও শ্রী পতিপ্রাণা। সুমিত্রা ও এলা অনূঢ়া, সেজন্য তারা প্রেম নিবেদন

করেছে দয়িতের পাদপদ্মে। শান্তি যেমন সত্যানন্দের কাছে বলছে—সে সহধর্মিণী হিসাবে স্বামী যে ধর্ম অবলম্বন করেছে, সেই ধর্মপালনের জন্যই সন্তান সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছে; চার অধ্যায়ে এলাও তেমনই অতীনকে বলছে—আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে কর অন্ত। আর সময় নেই—গান্ধর্ব বিবাহ হোক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে। সব্যসাচীর প্রতি সুমিত্রার মনের প্রগাঢ় অনুরাগ ভারতীর কাছে অজ্ঞাত ছিল না, যদিও শরৎচন্দ্র সুমিত্রা চরিত্রকে সেরকম জীবন্ত করতে পারেননি, যেরকমভাবে তিনি সজীব করে তুলেছেন ভারতীর বেদনাসিক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের দাবদাহকে।

উপন্যাস হিসাবে চার অধ্যায় স্বল্পপরিমিত হলেও তাতে পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে এলার চরিত্র। অতীন্দ্র ও ইন্দ্রনাথের সঙ্গে এলার সংলাপের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভা এলা চরিত্রকে পূর্ণবিকশিত ও মহীয়সী করে তুলেছে। এলা সুমিত্রার মতো বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যবর্তিনী নয়। সমগ্র বিশ্বের সামনে সে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার অন্তরের গুহায় অবরুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ড দহন ব্যক্ত করে।

প্রমীলা রহস্যময়ী

অনেকসময়ই তার আচরণের দিক দিয়ে নারী রহস্যময়ী হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ এক রহস্যময়ী নারীর বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী বিমল মিত্র তাঁর 'আসামী হাজির' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়িকা নয়নতারা এক রহস্যময়ী নারী। বিমল মিত্র তাঁর এই উপন্যাসে নয়নতারার যে জীবনকাহিনী বিবৃত করেছেন, তার আঁকে-বাঁকে নয়নতারার আচরণ নয়নতারাকে এক রহস্যময়ী নারী করে তুলেছে। অথচ এই জীবনকাহিনীর মধ্যে কাল্পনিক কিছু নেই। আমাদের বাস্তবজীবনে আমরা নয়নতারাকে এখানে সেখানে সর্বত্রই দেখতে পাই। সেদিক থেকে বিমল মিত্রের এই কাহিনী এক চলমান সমাজের জীবন্ত চিত্র। এই অসামান্য উপন্যাসখানা যাঁরা পড়েননি, তাঁদের সকলকেই অনুরোধ করব, উপন্যাসখানা পড়তে। অবশ্য যাঁরা বিমল মিত্রের অন্যান্য উপন্যাস পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে বিমল মিত্র গত তিনশো বছরের বাঙালী জীবনের প্রশস্ত রাজপথ ও তার অলিগলির ভিতর প্রবেশ করে বিভিন্ন প্রজন্মের বাঙালী নারীর যে স্বরূপ দেখেছেন ও আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তাতে নারী সর্বত্রই রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। তার মানে নারীর একটা কালজয়ী রূপ আছে। সে রূপ হচ্ছে নারী রহস্যময়ী।

নয়নতারা কেষ্টনগরের পণ্ডিতমশাই কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যের একমাত্র সন্তান। পণ্ডিতমশাইয়ের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। সেজন্য তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র নিখিলেশকেই সবসময়ে ডাকেন নিত্যনৈমিত্তিক জিনিস-পত্তর কেনাকাটার জন্য, অসুস্থ হলে ডাক্তার ডাকবার জন্য, ওষুধপত্তর কিনে আনার জন্য।

নয়নতারা অপরূপা সুন্দরী। তার রূপ দেখেই নবাবগঞ্জের জমিদার

নরনারায়ণ চৌধুরীর পরিবার তাকে পছন্দ করেছিল, নরনারায়ণের নাতি সদানন্দের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য। বিয়ে করে সদানন্দ যখন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল, নবাবগঞ্জের লোক তখন অবাক হয়ে গিয়েছিল নয়নতারার রূপ দেখে। সকলে একবাক্যে বলেছিল, এ যেন ডানাকাটা পরী। কথাটা শুনে নয়নতারার আনন্দ হয়েছিল। তখন সে ভাবেনি যে তার এত রূপ ব্যর্থ হবে সদানন্দকে তার সান্নিধ্যে আনতে।

সদানন্দ বিদ্বান ছেলে। বি. এ. পাস করেছে। কিন্তু তার মনোভাব এলোমেলো, আচার-আচরণ ছন্নছাড়া। নরনারায়ণের বিরাট ঐশ্বর্যের প্রতি সে বিমুখ। সে জেনেছিল নরনারায়ণের এই বিরাট বৈভবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে আছে পাপের শাখা-প্রশাখা।

প্রথমজীবনে নরনারায়ণ ছিল কালীগঞ্জের জমিদার হর্ষনাথ চক্রবর্তীর পনেরো টাকা মাইনের নায়েব। হর্ষনাথের ছিল অগাধ বিশ্বাস নরনারায়ণের ওপর। কিন্তু শেষজীবনে হর্ষনাথের চৈতন্যোদয় হয়েছিল। তিনি সজ্ঞানে নবদ্বীপের গঙ্গায় দেহত্যাগ করেন। মরবার সময় তিনি নরনারায়ণকে বলেছিলেন—বাবা, আমি চললাম, তুমি আমার বিধবাকে দেখো। কয়েকদিনের মধ্যেই রহস্যজনকভাবে হর্ষনাথের ওয়ারিশনদের মৃত্যু ঘটল। নরনারায়ণ জমিদারীটা গ্রাস করে নিয়ে, নিজে জমিদারী পত্তন করল নবাবগঞ্জে। হর্ষনাথের অসহায়া বিধবা 'কালীগঞ্জের বউ' মামলা করল। নরনারায়ণ সে-মামলা ভণ্ডুল করে দিল, তাকে দশ হাজার টাকা নগদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

দশ বছর ধরে কালীগঞ্জের বউ এসেছে নরনারায়ণের কাছে ওই টাকার জন্য। কিন্তু নরনারায়ণ তাকে দেয়নি। দিয়েছে কেবল স্তোক-বাক্য ও আশা। সদানন্দ নিজের চোখে দেখেছে তার দাদুর এই প্রতারণামূলক আচরণ। আরও দেখেছে যে, মাত্র চার পয়সার জন্য নিরীহ নিরপরাধ পায়রাপোরাকে ঠগ্ বানিয়ে তার সর্বনাশ করা হয়েছে। মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে। অথচ

প্রকৃত ঠগ্ হচ্ছে কৈলাস গোমস্তা। সে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে বাবুদের নেকনজরে রয়ে গিয়েছে। সদানন্দ আরও দেখেছে যে একই-ভাবে সর্বনাশ করা হয়েছে মানিক ঘোষ ও ফটিক প্রামাণিকদেরও। বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে সদানন্দের মন, পাপের ওপর প্রতিষ্ঠিত নর-নারায়ণের জমিদারীর ওপর।

নরনারায়ণ চায় এইভাবে তার জমিদারীর প্রসার ঘটুক। নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে তার বংশধারা চলুক এই জমিদারীর ধারা সংরক্ষণে। সেজন্যই তিনি সদানন্দর বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের দিন সদানন্দ হল নিরুদ্দেশ। তার প্রকাশ মামা তাকে ধরে নিয়ে এল কালীগঞ্জের বউয়ের বাড়ি থেকে। সদানন্দ বলে, আগে তোমরা কালীগঞ্জের বউয়ের টাকা দাও, তবে আমি বিয়ে করব। নরনারায়ণ বলে, তুই বিয়ে করে এলেই আমি কালীগঞ্জের বউয়ের টাকা দিয়ে দেব। বিয়ে করে এসে সদানন্দ কালীগঞ্জের বউয়ের টাকা চায়। কিন্তু নরনারায়ণ কথার খেলাপ করে।

বিয়ের ফুলশয্যার দিন রবাহূত হয়ে আসে কালীগঞ্জের বউ, সদানন্দের বউকে আশীর্বাদ করতে। আবার টাকার কথা ওঠে। নরনারায়ণ তাকে কড়া কথা বলে। উঠোনে দাঁড়িয়ে কালীগঞ্জের বউ অভিশাপ দেয়, 'নারায়ণ, তুমি নির্বংশ হবে।'

নরনারায়ণ বংশী ঢালীকে ডেকে গোপনে কি নির্দেশ দেয়। ইতিহাসের পাতা থেকে চিরকালের মতো কালীগঞ্জের বউ ও তার চার পালকিবাহক উধাও হয়ে যায়। সদানন্দ গোপনে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ আসে। কিন্তু অতীতের আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। টাকা পেয়ে পুলিশ চলে যায়।

সদানন্দ এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে ওঠে। এর প্রতিঘাত গিয়ে পড়ে নয়নতারার ওপর। ফুলশয্যার দিন রাত্রে সে নয়নতারার সঙ্গে এক-বিছানায় শোয় না। সে ঘর থেকে

পালায়। নয়নতারার মন বিষাদে ভরে যায়। এদিকে খবর আসে যে ওই ফুলশয্যার দিন রাত্রেই কেষ্টনগরে তার মা কন্যা-বিচ্ছেদ সইতে না পেরে মারা গেছেন।

বাবাকে শান্ত করার জন্য নয়নতারাকে বাপের বাড়ি পাঠানো হয়। নয়নতারা আবার ফিরে আসে। ভট্টাচার্যমশাইও একদিন নিজে নয়নতারার বাড়ি আসেন। যাবার সময়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করে যান —'সুখে থাক মা, স্বামীর সংসারে লক্ষ্মী হয়ে থাকো, মনেপ্রাণে স্বামীর সেবা কর, মেয়েমানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর নেই। তুমি মনেপ্রাণে স্বামীর ঘর কর, তাই দেখেই তোমার মায়ের স্বর্গত আত্মা সুখী হবে।'

এদিকে নবাবগঞ্জে সদানন্দর শয়নঘরে সেই একই দৃশ্য। শাশুড়ী রুষ্ট হয়ে বউকে ভর্ৎসনা করে বলে, 'তোমার রূপ নিয়ে কি আমরা ধুয়ে খাব! আমাদের এই বিরাট ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য চাই নাতি। সেজন্যই তো তোমাকে আমরা এনেছি। তুমি যেরকমভাবে পার, তোমার রূপ দিয়ে সদাকে বশীভূত করে, আমাকে নাতি এনে দাও।'

নয়নতারা সেদিন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে আর শোবার ঘরে নির্বাক দর্শক হয়ে থাকে না। আজ সদানন্দকে সে বশীভূত করবেই। আজ তাকে সে বিছানায় টেনে আনবেই। আর তা নয়তো, সে একটা হেস্তনেস্ত করবে। একটা মোকাবিলা এর চাই-ই।

কিন্তু সদানন্দ অচল অটল। নয়নতারার কথার উত্তর না দিয়ে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নয়নতারা পিঠ দিয়ে কপাট চেপে ধরে, সদানন্দর মুখোমুখি হয়ে বলে—'তুমি না-হয় তোমার বাপ-ঠাকুরদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছ, কিন্তু আমি কেন তোমার সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করতে যাব?' তারপর কথা-কাটাকাটি হয়। হঠাৎ সদানন্দ টেবিল থেকে একটা কাঁচের দোয়াতদানি তুলে নিয়ে কপালে ঠুকতে থাকে। কপাল ফুঁড়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ঘরের মেঝে ভাসিয়ে

দেয়। তাই দেখে নয়নতারা অজ্ঞান হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে যায়। সদানন্দ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর থেকেই সে হয় নিরুদ্দেশ।

এদিকে শব্দ শুনে শাশুড়ী প্রীতিলতা ছুটে এসে দেখে রক্তাক্ত মেঝের ওপর নয়নতারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। চৈতন্য ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়নতারা প্রশ্ন করে, উনি কেমন আছেন ? প্রীতিলতা বলে, সদানন্দ ভাল আছে, উপরের ঘরে শুয়ে আছে। নয়নতারা বলে, আমি ওঁকে একবার দেখতে যাব। প্রীতি বলে, ডাক্তারের মানা আছে, তুমি পরে দেখা কোরো।

রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, নয়নতারা সদানন্দকে দেখবার জন্য চুপিচুপি উপরে উঠে যায়। কিন্তু যা দেখে, তা তার চোখের সামনে খুলে দেয় নবাবগঞ্জের ইতিহাসের আর এক কদর্য পৃষ্ঠা। কিছুদিন যাবৎ নরনারায়ণ অসুস্থ হয়েছেন। কৃপণ পুত্র হরনারায়ণ চিকিৎসার খরচে বিব্রত হয়ে পড়েছে। নয়নতারা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে খরচের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তার শ্বশুর তার পিতাকে গলা টিপে মেরে ফেলছে।

সদানন্দ আর ফেরেনি। নয়নতারা একলাই শয়নঘরে শোয়। শাশুড়ী বলে—বউমা শোবার আগে ভাল করে দরজায় খিল দেবে। একদিন শাশুড়ী হঠাৎ বলে বৌমা, আজ থেকে তুমি দরজায় খিল না দিয়েই শোবে। নয়নতারা তো অবাক। কেন এরকম বিদকুটে নির্দেশ ! রাত্রে ভয়ে তার ঘুম এল না। বিছানায় জেগেই পড়ে রইল। রাত্রে দেখে ঘরের দরজাটা খুলে একজন পুরুষমানুষ তার ঘরে ঢুকল। নয়নতারা তাকে চিনতে পারল—তার শ্বশুর। নয়নতারা আঁতকে ওঠে। লোকটা ভয় পেয়ে বেরিয়ে যায়। পরের দিন লোকটা ঘরে ঢুকে তার গায়ে হাত দেয়। এক ঝটকা মেরে নয়নতারা হাতটা সরিয়ে দেয়। তারপর বিছানা থেকে উঠে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পাশে বিহারী-

পালের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। বিহারী পালকে নবাবগঞ্জের জমিদাররা দেখতে পারে না, কেননা ইদানিং কালে লড়াইয়ের মৌকায় বিহারী পালের সমৃদ্ধি বেড়েছে। কিন্তু বিহারী পালের স্ত্রী নয়নতারাকে খুব ভালবাসে। নয়নতারা তাকে দিদিমা বলে। শ্বশুরের কুৎসিত প্রয়াসে সন্ত্রস্তা হয়ে নয়নতারা পরের দিন বিহারী পালের বাড়ি গিয়ে দিদিমার কাছে আশ্রয় নেয়। ভোরের আগেই নিজের ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু শাশুড়ী সব টের পেয়ে নয়নতারাকে শাসায় সে যেন বিহারী পালের স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখে।

নয়নতারার বিদ্রোহী মন জ্বলে ওঠে। বিহারী পালের স্ত্রীকে সে বলে, 'কাল আপনি নবাবগঞ্জের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমাদের বৈঠকখানায় আসতে বলবেন।'

পরের দিন বার-বাড়িতে নবাবগঞ্জের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমবেত হতে দেখে, নয়নতারার শ্বশুর বিস্মিত। জিজ্ঞাসাবাদে জানে তার বৌমা তাঁদের আসতে বলেছে। ক্ষণিকের মধ্যে নয়নতারা সেখানে উপস্থিত হয়ে, সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে নবাবগঞ্জের কুৎসিত ইতিহাস বিবৃত করে যায়। তার শ্বশুর যে তার সতীত্বনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে-কথাও সে বলে। জনমণ্ডলী রায় দেয়, নয়নতারাকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। বাপের বাড়ি যাবার আগে নয়নতারা কুয়োতলায় গিয়ে হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলে, হাতের নোয়া খুলে জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কুয়োর জলে সিঁথির সিঁদুর ধুয়েমুছে ফেলে।

কেষ্টনগরে তার বাবার সামনে গিয়ে যখন নয়নতারা দাঁড়ায়, বাবা নয়নতারার এয়োস্ত্রী চিহ্নসমূহ না দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। প্রশ্ন করেন, 'আমার জামাই কোথায়?' নয়নতারা উত্তর দেয়, 'নেই, নেই, নেই। তোমার জামাই কোনদিন ছিল না, এখনও নেই। আমি তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে চলে এসেছি। এখন আমি তোমার কাছেই

থাকব।' নয়নতারার উক্তি বৃদ্ধ ভটচার্যি মশাইকে নিদারুণ মানসিক আঘাত দেয়। বৃদ্ধ সহ্য করতে পারেন না। স্ট্রোক্ হয়। মারা যান। তাঁর প্রিয় ছাত্র নিখিলেশই তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যায়।

শ্মশান থেকে ফিরে এসেই নিখিলেশ নয়নতারার কাছে প্রস্তাব করে, 'তুমি আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী হয়ে এস।' নয়নতারা তখন শোকে মুহ্যমান। একমাত্র অবলম্বন বাবাকে হারিয়ে ভবিষ্যৎ তখন তার কাছে অন্ধকার হয়ে গেছে। নয়নতারার সমস্ত মন নিখিলেশের ওপর বিষিয়ে ওঠে। মনে হয় যেন নিখিলেশ এতদিন তার বাবার মৃত্যুর জন্যই প্রতীক্ষা করছিল। যেন নয়নতারার অসহায়তার সুযোগ খুঁজছিল সে। যেন নয়নতারার শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসাটাই তার কাছে কাম্য ছিল। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ে তার আশ্রয়ের কথা, তার জীবিকানির্বাহের কথা, তার নিজের ভরণপোষণের কথা। তখন তার চোখের সামনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, বোধহয় বর্তমান বলেও কিছু নেই। শুধু আছে একটা অতীত, তা সেটা স্মরণ করতেও তার ভয় হয়।

নয়নতারা নিখিলেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। একদিন কলকাতায় এসে তাদের বিয়ে রেজেস্ট্রি হয়ে যায়। তারা যেমন বলল, তেমনি সই করল সে। রেজেস্ট্রি অফিসে তারা কী প্রশ্ন করল, তা তার কানে ভাল করে ঢুকল না। কালীঘাটে গিয়ে সিঁথিতে সিঁদুরও পরানো হল। তারপর তারা নৈহাটিতে এসে একটা বাড়ি ভাড়া করে। নিখিলেশ তাকে যা বলত, সে তাই-ই করতে চেষ্টা করত। সে যেন এক কলের পুতুল। নিখিলেশ তাকে দম দিয়ে ছেড়ে দিত, আর সে কলের পুতুলের মতো শুত, ঘুমোত, ভাবত, হাসত, নড়ত—সবকিছু করত। কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না। নিখিলেশ তাকে বাড়িতে পড়িয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করিয়ে, একটা সরকারী চাকরিও যোগাড় করে দেয়। নিখিলেশের অফিস আগে শুরু হয়। সেজন্য সে আগের ট্রেনে কলকাতায় আসে। নয়নতারা পরের ট্রেনে কলকাতায় আসে

অফিস করতে। দু'জনে একসঙ্গেই বাড়ি ফেরে। মনে হয় নয়নতারার জীবন সহজ সরল হয়ে গেছে। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে যখন সিঁথিতে সিঁদুর পরে, মনে হয় কে যেন তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লজ্জায় ঘেন্নায় শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলে। রাত্রে নিখিলেশের পাশে সে যখন শুয়ে থাকে. এক এক দিন একটা পুরানো মুখের ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে চমকে ওঠে।

এদিকে নবাবগঞ্জের ইতিহাসে ওলট-পালট ঘটে যায়। নয়নতারার শাশুড়ী প্রীতিলতা মারা যায়। প্রীতিলতা ছিল সুলতানপুরের জমিদার কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান। প্রীতিলতাই ছিল তাঁর বিরাট জমিদারির একমাত্র ওয়ারিসান। প্রীতিলতার মৃত্যুর পর, কীর্তিপদবাবুও একদিন মারা যান। নবাবগঞ্জে নিঃসঙ্গ জীবন হর-নারায়ণের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। নবাবগঞ্জের সমস্ত সম্পত্তি প্রাণকৃষ্ণ শা'কে চার লক্ষ টাকায় বেচে দিয়ে, হরনারায়ণ সুলতানপুর চলে যায়। কিন্তু ওই সম্পত্তি ভোগ করা প্রাণকৃষ্ণর সইল না। সেও একদিন মারা গেল। তারপর নবাবগঞ্জের জমিদারদের বাড়ি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়।

হরনারায়ণ সুলতানপুরে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করে পাঁউরুটি ও দুধ খেয়ে জীবন কাটাতে থাকে। একদিন সুলতানপুরের লোক দেখে, হরনারায়ণ আর শোবার ঘরের দরজা খোলে না। শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তারা দেখে হরনারায়ণের জীবনাবসান ঘটেছে।

এদিকে সদানন্দর জীবনেও বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ ঘটে যায়। বউ-বাজারের বিরাট ধনশালী ব্যক্তি সমরজিৎবাবু একদিন সদানন্দকে রানাঘাট স্টেশন থেকে তাঁর বাড়ি নিয়ে আসেন। সমরজিৎবাবু নিঃসন্তান বলে সুশীল সামন্ত নামে একটি ছেলেকে পুষ্যি নিয়েছিলেন। তাকে মানুষ করে তার বিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু সুশীল সামন্ত পুলিশের চাকরিতে ঢুকে মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত হওয়ায়, সমরজিৎবাবু

তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সদানন্দকে দেবার মতলব করেন। টের পেয়ে সদানন্দ কাউকে কিছু না বলে সমরজিৎবাবুর বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

সদানন্দর এখন আশ্রয়স্থল বড়বাজারে পাঁড়েজির ধরমশালা। পাঁড়েজি ধরমশালার ম্যানেজার। লোক ভালো। সদানন্দকে তুটো টুইশনি যোগাড় করে দেয়। কিন্তু সদানন্দ ছেলে পড়িয়ে যে টাকা পায়, ধরমশালায় নিয়ে আসে না। পথে ভিখারীদের বিলিয়ে দেয়। তাদের কাছে সদানন্দ 'রাজাবাবু'। ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে দেখে, পাঁড়েজি সদানন্দকে একখানা আলোয়ান কিনে দেয়। সদানন্দ সেটা এক নিরাশ্রয়া বুড়ীকে বিলিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা লেগে সদানন্দ অসুখে পড়ে। পাঁড়েজি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। সুস্থ হয়ে সে পাঁড়েজিকে বলে, আমি একবার নবাবগঞ্জ থেকে ঘুরে আসি। ক্লান্তি, অবসাদ ও অনশনে নৈহাটির কাছে সে ট্রেনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ট্রেনের গার্ড তাকে নৈহাটি স্টেশনে নামিয়ে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময়ে একজন মহিলা ভিড় ঠেলে, সামনে এসে বলে, ওঁকে আপনারা হাসপাতালে পাঠাবেন না। আমি ওঁকে বাড়ি নিয়ে যাব। উনি আমার নিকট আত্মীয়। আমার নাম নয়নতারা ব্যানার্জি।

অচৈতন্য সদানন্দকে নিজ বাড়িতে এনে, নয়নতারা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যায়। গড়িয়ে গড়িয়ে তু'মাস গত হয়, তবুও সদানন্দর জ্ঞান ফেরে না। নিরলসভাবে রাত জেগে নয়নতারা তার সেবা করে যায়। চাকরি হবার পর নয়নতারা কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছিল। নয়নতারার ইচ্ছে ছিল কয়েক বছর পরে যখন আরও কিছু টাকা হবে তখন কলকাতা শহরে তারা একটা বেশ ছোটখাটো সাজানো-গোজানো বাড়ি করবে। কিন্তু সদানন্দর চিকিৎসার জন্য সে-সব টাকা নিঃশেষিত হয়ে যায়। নিখিলেশের দেওয়া দশ ভরির সোনার হারটাও সে বাঁধা দেয়। দিনের পর দিন, রাত

জেগে সদানন্দের মাথার ওপর সে আইস-ব্যাগ ধরে বসে থাকে। ডাক্তারবাবু তো দেখে অবাক। বলেন, লোকের স্ত্রী তো দূরের কথা, নিজের মা-ও এমনভাবে সেবা করতে পারে না।

কিন্তু নিখিলেশ চটে লাল! তার মনে হয় তার জীবনটা যেন ছত্রখান হয়ে গেছে। নয়নতারাকে সে বলে, ওকে তুমি হাসপাতালে পাঠিয়ে দাওনা। তারপর যখন দেখে যে তার কথায় কোন কাজ হল না, তখন সে সদানন্দকে মারবার জন্য ওষুধের বদলে বিষ কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর নজরে পড়ায় সদানন্দ বেঁচে যায়। নয়নতারা শিশিটা তুলে রাখে, যদি কোনদিন ওটা তার নিজের কোন কাজে লাগে!

তারপর একদিন সদানন্দর জ্ঞান ফিরে আসে। সামনে নয়নতারাকে দেখে সে বিস্মিত হয়। তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ট্রেনের মধ্যে কিভাবে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, নয়নতারা তাকে দেখতে পেয়ে নিজের বাড়িতে এনে কিভাবে তাকে ভাল করে তুলেছে, সব শোনে। একমুহূর্তও তার সেখানে থাকতে ভালো লাগে না। নিখিলেশের আচরণ থেকে সে বোঝে যে তার উপস্থিতির ফলে, নয়নতারার সুখের সংসারে চিড় ধরেছে। একদিন কাউকে কিছু না বলে সে সেখান থেকে সরে পড়ে। নয়নতারা নিখিলেশকে পাঠায় তার খোঁজে নবাবগঞ্জে। নিখিলেশ নবাবগঞ্জে না গিয়ে, ফিরে এসে নয়নতারাকে বলে, সদানন্দ আবার বিয়ে করে দিব্যি সুখে আছে। কিন্তু নয়নতারার মনে সংশয় জাগে। সে নিজে নবাবগঞ্জে গিয়ে দেখে, নিখিলেশ তাকে সব মিছে কথা বলেছে। নিখিলেশের ওপর তার বিতৃষ্ণা হয়। সে আলাদা ঘরে শুতে থাকে। তারপর সে ঠিক করে, সে কলকাতায় গিয়ে মেয়েদের এক বোর্ডিং-এ থাকবে।

এদিকে নৈহাটি থেকে চলে আসবার পর, সদানন্দর সঙ্গে তার প্রকাশ মামার দেখা হয়। প্রকাশ মামা তাকে নিয়ে যায়, হরনারায়ণ

ও কীর্তিপদর একমাত্র ওয়ারিসন হিসাবে সদানন্দকে দিয়ে সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট বের করবার জন্য। সদানন্দ এখন আট লক্ষ টাকার মালিক। চার লক্ষ টাকা সে দান করে নবাবগঞ্জের লোকদের স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল করবার জন্য, আর বাকী চার লক্ষ টাকা নিয়ে সে আসে নৈহাটিতে নয়নতারার বাড়ি। ঠিক সেই মুহূর্তেই নয়নতারা বেরিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায় মেয়েদের বোর্ডিং-এ থাকবার জন্য। সদানন্দকে সে বাড়ির ভিতরে এনে নিজের ঘরে বসায়। নিখিলেশ সেদিন সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে নয়নতারার ঘরে সদানন্দকে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। সদানন্দকে সে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তারপর দেখে টেবিলের ওপর সদানন্দ একটা প্লাস্টিকসের ব্যাগ ফেলে গেছে। ব্যাগ খুলে দেখে তার ভিতর রয়েছে একখানা চার লক্ষ টাকার চেক নিখিলেশ ও নয়নতারার নামে। চেকখানা পাবার পর নিখিলেশ ও নয়নতারার মধ্যে সমস্ত মনোমালিন্য কেটে যায়। আবার তাদের মধ্যে ভাব হয়।

নিখিলেশ তাকে নয়নতারার বাড়ি থেকে বের করে দেবার পর, সদানন্দ আবার চলতে থাকে। শেষে এসে দাঁড়ায় ও আশ্রয় পায় চৌবেড়িয়ায় রসিক পালের আড়তবাড়িতে। কিছুকাল পরে সেখানে আবির্ভাব ঘটে সদানন্দর দ্বিতীয় সত্তার—হাজারি বেলিফের, যে এতদিন ছায়ারূপে তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হাজারি বেলিফ বলে, আপনি আপনার পিতাকে খুন করেছেন, আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। হাজারি বেলিফকে সে অনুরোধ করে একবার তাকে যেন সুলতানপুর, নবাবগঞ্জ ও নৈহাটিতে নিয়ে যায়। আত্মগোপন করে সে সুলতানপুরের লোকদের জিজ্ঞাসা করে, সদানন্দ চৌধুরীকে তারা চেনে কিনা। একবাক্যে সকলে বলে, সদানন্দ চৌধুরী তো তার বাপকে খুন করবার পর থেকে পলাতক। নবাবগঞ্জে এসে দেখে অন্তর্দ্বন্দ্বে স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল সব জ্বলছে আর এই অশান্তির কারণ হিসাবে নবাবগঞ্জের

লোক সদানন্দকে অভিশাপ দিচ্ছে। নৈহাটিতে এসে শোনে, নিখিলেশ ও নয়নতারা সেখানে থাকে না। লটারিতে চার লক্ষ টাকা পেয়ে, তারা থিয়েটার রোডে বাড়ি করে সেখানে থাকে। থিয়েটার রোডে এসে দেখে সেখানে সেদিন উৎসব, নয়নতারার প্রথম সন্তানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে। এমবেসির লোক, পুলিশের বড়সাহেবরা, আরও কত কে বিশিষ্ট অতিথি সেখানে আসছে। সদানন্দ ও হাজারি বেলিফকে দারোয়ানরা সামনের গেট থেকে তাড়িয়ে দেয়। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে তারা দাঁড়ায় মুখোমুখি হয়ে নয়নতারার সামনে। নয়নতারা প্রথমে সদানন্দকে চিনতে পারেনি, ভেবেছিল ডেকরেটরের লোক। তারপর সদানন্দকে চিনতে পেরে বলে, ওঃ তুমি, আজ আমি খুব ব্যস্ত, তুমি কাল এস। এই কথা বলে সে অতিথি আপ্যায়নের কাজে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ এক আর্তনাদের শব্দ শুনে ছুটে আসে। সদানন্দ তার দ্বিতীয় সত্তা হাজারি বেলিফকে খুন করেছে। পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করতে যাচ্ছে এমন সময় দু'হাত বাড়িয়ে নয়নতারা বাধা দিতে যায়। বলে, 'তোমরা ওঁকে অ্যারেস্ট কোরোনা। যত টাকা লাগে আমি দেব, আমার যথাসর্বস্ব দেব। উনি আমার স্বামী।' থিয়েটার রোডের বাড়িটার পরিবেশ একমুহূর্তে বদলে যায়। সকলেই স্তম্ভিত। কেবল নিখিলেশ নয়। সে নয়নতারাকে বলে, কী পাগলামি করছ! কথাটা শুনে নয়নতারা অজ্ঞান হয়ে মেঝের ওপর পড়ে যায়। তার চোখের জলে তার মুখের ও গালের 'ম্যাকস্ ফ্যাকটর' ধুয়ে মুছে যায়! তার কানে কেবল বাজতে থাকে সদানন্দর বলা শেষ কথাগুলো—'আমি আসামী, আমি মানুষকে বিশ্বাস করেছিলুম, আমি মানুষকে ভালবেসেছিলুম, আমি মানুষের শুভ কামনা করেছিলুম, আমি চেয়েছিলুম মানুষ সুখী হোক, আমি চেয়েছিলুম মানুষের মঙ্গল হোক। কিন্তু আজ এই পনেরো বছর পরে জানলুম মানুষকে বিশ্বাস করা, মানুষকে ভালবাসা, মানুষের শুভ কামনা করা পাপ, আমি তাই আজ পাপী, আমি

তাই আজ অপরাধী, আমি তাই আজ আসামী, আমাকে আপনারা আমার পাপের শাস্তি দিন, আমাকে ফাঁসি দিন—।' বইখানির এইখানেই ইতি।

বিমল মিত্রের ৮৫৫ পাতার বই 'আসামী হাজির' উপন্যাসের এটাই হচ্ছে একটা সংক্ষিপ্ত কঙ্কাল বা কাঠামো। কিন্তু কুলাল-শিল্পী যেমন কাঠামোতে মাটি লেপে, রঙ চাপিয়ে, তাকে সুন্দর মূর্তিতে পরিণত করে, বিমল মিত্রও তাই করেছেন। বস্তুত বইখানির 'ইসথেটিক বিউটি' (aesthetic beauty) বা নান্দনিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে, সমগ্র বইখানি পড়া দরকার। এক ছাদের তলায় স্ত্রীর দুই স্বামীর সহাবস্থান, এবং দু'জনের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা পালনের melody আমি আর কোন উপন্যাসে পড়িনি। বেদ-পুরাণেও নয়। এ বই প্রমাণ করে, কথাশিল্পী হিসাবে বিমল মিত্র কত বড় প্রতিভাশালী লেখক। বাংলা ভাষায় পূর্বে এরূপ বই লেখা হয়নি, পরেও হবে না। জীবন সম্বন্ধে এখানি এক মহাকাব্য—এ হিউম্যান স্টোরি। একমাত্র বিমল মিত্রের পক্ষেই এ-রকম বই লেখা সম্ভবপর হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে অ-সাধারণ লোককে, 'ভালো মানুষ'কে জগতের লোক ভুল বোঝে। মানুষ সৎ হলে, তার যে কি শোচনীয় পরিণতি হয়, এখানা তারই এক বিশ্বস্ত দলিল। আর দেখিয়েছেন নারী চরিত্র কত দুর্ভেদ্য। নারী চরিত্রের এই দুর্ভেদ্যতাই নারীকে রহস্যময়ী করে তুলেছে। নারীর অবচেতন মনের গভীরে যে বাসনা বাসা বাঁধে, সেখানে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলে, তা অনুধাবন করা খুবই কঠিন। কিন্তু বিমল মিত্র নারীর সেই অবচেতন মনকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করে ধরেছেন, উচ্ছ্বাস বা আবেগময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে নয়,—সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমে, চরিত্র অঙ্কনের বিশিষ্ট মুন্সিয়ানাতে, বিচিত্র ও জটিল ঘটনাপ্রবাহের বিন্যাসে ও নারীর বাহ্যিক আচরণের ভিতর দিয়ে।

সদানন্দর পাশাপাশি তিনি চিত্রিত করে গেছেন, একজন কদাচারী

ইতর ব্যক্তিকে, নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নিখিলেশ যে একজন দুর্নীতিপরায়ণ ইতর ব্যক্তি সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নৈহাটির বাড়িতে একদিন সামান্য কথা-কাটাকাটির মধ্যে নিখিলেশ নয়নতারাকে 'স্কাউণ্ড্রেল' বলে গালি দিয়ে অপমান করেছিল। কিন্তু সে নিজে যে কতবড় স্কাউণ্ড্রেল, তা সে নিজে কোনদিনই বুঝতে পারল না। তা না হলে যে পণ্ডিতমশাইয়ের সে ছিল প্রিয় ও বিশ্বস্ত ছাত্র, সেই পণ্ডিতমশাইয়ের মৃত্যুতে তার বিন্দুমাত্র শোক হল না। পণ্ডিত-মশাইকে শ্মশানে দাহ করে ফিরে আসবার পরমুহূর্তেই সে পণ্ডিত-মশাইয়ের অসহায় ও শোকে মুহ্যমান কন্যা নয়নতারার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসল। সব জেনেশুনেই সে পরস্ত্রীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবার লোভ সামলাতে পারল না। নয়নতারার রূপই তাকে লুব্ধ করল। মাত্র রূপ নয়। অর্থগৃধ্নুতাও। নয়নতারার কোনদিনই কোন বিধিসম্মত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেনি। সুতরাং শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নয়নতারা পরস্ত্রীই ছিল। শেষমুহূর্তে থিয়েটার রোডের বাড়ির উৎসবের সমারোহের মধ্যে যখন নয়নতারা প্রকাশ্যে সদানন্দকেই স্বামী বলে ঘোষণা করল, তখনও সে নয়নতারার ওপর তার লোভ পরিহার করতে পারল না। সে ভালো করেই জানত যে, যে-সমাজের মধ্যে তার ও নয়নতারার অবস্থান সে-সমাজে এক নারীর দুই স্বামীর সহাবস্থান অবৈধ। এ কথা জেনেও সে নয়নতারার হাত ধরতে গিয়েছিল, বলেছিল—কী পাগলামি করছ! নয়নতারা নিখিলেশের ভুল ভাঙেনি দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। নয়নতারা নিখিলেশকে ভালোরূপেই জানত। জানত তার ওপর নিখিলেশের অবৈধ আসক্তি ও লোলুপতা, জানত তার অর্থগৃধ্নুতা, যার জন্য সে নয়নতারাকে চাকরি করতে বাধ্য করেছিল, জানত নিখিলেশ তার গহনাগুলোর লোভে নির্লজ্জভাবে সেগুলো তার শ্বশুর-বাড়িতে চাইতে গিয়েছিল, জানত সদানন্দকে বিষ খাইয়ে মারবার জন্য নিখিলেশ বিষ কিনে এনেছিল। এসব জেনেও সে নিখিলেশের সঙ্গে

পনেরো বছর 'কাগজের বউ' সেজে ঘর করেছিল! এখানেই নয়নতারা রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। অথচ তার অন্তরাত্মা বা অবচেতন মন নিখিলেশকে চায়নি, চেয়েছিল সদানন্দকে। সেজন্যই আয়নার সামনে সে যখন সিঁথিতে সিঁদুর পরতে যেত তখন সে নিজের পিছনে সদানন্দকে দেখত। রাত্রে নিখিলেশের পাশে সে যখন শুয়ে থাকত, সদানন্দর মুখখানাই তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। সে স্বপ্ন দেখত সদানন্দ এসেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। সদানন্দ যেদিন নৈহাটিতে শেষ-বারের জন্য তার বাড়ি গিয়েছিল, সেদিন নয়নতারা নিজেই সদানন্দকে বলেছিল, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল। সে মনে-প্রাণে জানত যে সদানন্দই তার প্রকৃত স্বামী, নিখিলেশ নয়। নিখিলেশের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে অবৈধ, তা সে ভালভাবেই জানত। সেজন্যই আয়নায় সে যখন তার পিছনে সদানন্দর মুখ দেখত, তখন লজ্জায় ঘেন্নায় সে শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে ফেলত। কিন্তু নিখিলেশের শেষ পর্যন্ত কোন লজ্জা-ঘেন্না ছিল না। কেননা, নয়নতারা যখন সদানন্দকে স্বামী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল সমবেত বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে, তখন সমবেত অতিথিমণ্ডলী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের স্তম্ভিত হবার তো কথাই। কেননা, তারা একমুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিয়েছিল যে, যে-সন্তানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তারা সেখানে সমবেত হয়েছে, সে-সন্তান এক জারজ সন্তান—পরস্ত্রীতে উপগত সন্তান। কিন্তু নিখিলেশের কিছুমাত্র মনের বিকৃতি ঘটেনি। তা না হলে সে নয়ন-তারার হাত ধরতে গিয়ে বলে, কী পাগলামি করছ! হ্যাঁ, যে সমাজের চিত্র বিমল মিত্র এঁকেছেন, সে সমাজে সত্যবাদিতার কোন স্থান নেই, সত্যবাদিতার কোন মূল্য নেই, সত্যবাদিতা তো সে-সমাজে নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সত্যবাদিতার জন্যই তো সদানন্দকে আসামী হতে হয়েছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তবে নয়নতারা কেন নিখিলেশের সঙ্গে স্বামী-

স্ত্রী রূপে ঘর করতে সম্মত হল? নিজ মুখেই সে স্বীকার করেছিল, সেদিন সে সম্মুখীন হয়েছিল আদিম মানবীর সমস্যার। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রস্তোপলীয় যুগের সেই আদিম মানবীর রক্তকণিকাই সে বহন করছিল তার শিরা-উপশিরায়। প্রস্তোপলীয় যুগে আশ্রয় ও প্রতিরক্ষাই তো আদিম মানবীকে প্রবৃত্ত করেছিল পুরুষকে ভজনা করতে। পিতার মৃত্যুর পর সেই সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছিল নয়নতারা। একমুহূর্তে নিখিলেশ তো সেদিন সে সমস্যার সমাধান করে দিতে পারত, বোন হিসাবে নয়নতারাকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়ে বোনের মতো তাকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করিয়ে চাকরি সংগ্রহ করে দিয়ে। সেভাবে সে তো নয়নতারাকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারত। কিন্তু তা সে সেদিন করেনি। পণ্ডিতমশাইয়ের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা সেদিন তার লুপ্ত হয়েছিল। সেদিন তার মধ্যে লেশমাত্র মানবিকতা ছিল না। নয়নতারার রূপই তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নয়নতারার বিবাহের পূর্বে নিখিলেশ তো অনবরতই তাদের বাড়ি আসত। তখনই তো নিখিলেশের অবচেতন মনের কোণে নয়নতারা বাসা বেঁধেছিল। সেদিন নয়নতারার নিজেরই মনে হয়েছিল, নিখিলেশ কি তার অসহায়তার প্রতীক্ষা করছিল? শ্বশুরবাড়ি থেকে সে চলে আসে, এটাই কি তার কাম্য ছিল? আবার সেদিন নয়নতারার আচরণও আমাদের বিস্মিত করে। সেদিন নয়নতারা হারিয়ে ফেলেছিল তার সেই তেজীয়ান সত্তা, যে সত্তা জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছিল নবাবগঞ্জে তার শয়নকক্ষে সদানন্দর গৃহত্যাগের দিন, বা যার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি সে প্রদর্শন করেছিল নবাবগঞ্জের জমিদারবাড়ির বৈঠকখানায় গণ-আদালতের সামনে। নিখিলেশ যেদিন তাকে তার স্ত্রী হবার প্রস্তাব করেছিল, সেদিন সে সেই কুৎসিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে, নিজেও তো স্বাবলম্বী হবার পথে পা বাড়াতে পারত। সে তো মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেছিল। সে তো টিউশনি করে নিজের স্বাধীন ও সাধ্বী সত্তা

অক্ষুণ্ণ রাখতে পারত। তা কিন্তু সে করেনি। বোধহয় সে তখন পিতৃশোকে কাতরা। শোকের কাতরতায় সেদিন তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। তার সামনে আর এক বিকল্পও অবশ্য ছিল। সে বিকল্প হচ্ছে, আত্মঘাতী হওয়া। আত্মঘাতী হবার কথা তো নয়নতারার মনে একাধিকবার জেগেছে। নবাবগঞ্জের শয়নকক্ষে সেই মোকাবিলার দিন, সদানন্দকেই তো সে বলেছিল, আমি আত্মঘাতী হইনি কেন, সেটাই আশ্চর্য। আবার আর একদিন আত্মঘাতী হবার পরিকল্পনার বশীভূত হয়েই তো নৈহাটির বাড়িতে, সদানন্দকে মারবার জন্য নিখিলেশ যে বিষ কিনে এনেছিল, তা সে তুলে রেখে দিয়েছিল, যদি কোনদিন সেটা তার নিজের কাজে লাগে। কিন্তু কোনদিন সে আত্মঘাতী হয়নি। কেননা, আত্মঘাতী হবার জন্য যে মনোবল দরকার, সে মনোবল তার ছিল না। অস্তিবাদী লেখিকা সিমোন দ্য বভোয়ার যিনি নারীচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুশীলন করেছেন, তিনি বলেছেন পুরুষের তুলনায় আত্মঘাতী হবার মনোবল মেয়েদের অনেক কম। সে মনোবল ছিল কাদম্বরীর। শোনা যায়, স্বামীর জামার পকেটে এক অভিনেত্রীর প্রেমপত্র দেখে সে বিশুকে দিয়ে আফিম কিনে আনিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল। সে কেন আত্মঘাতী হয়েছিল, সে-কথা সে লিখে রেখে গিয়েছিল। সে-চিঠি যদি সেদিন মহর্ষি সঙ্গে সঙ্গে না বিনষ্ট করতেন, তা হলে আজ আমরা নারীর জীবনের মর্মস্থলের বেদনার একটা সন্ধান পেতাম—নারী কেন আত্মঘাতী হয়?

পণ্ডিতমশাই যখন নবাবগঞ্জে মেয়েকে দেখতে গিয়েছিলেন, তখন ফিরে আসবার সময় তিনি নয়নতারাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, ‘মা, স্বামীর সেবা কর, মেয়েমানুষের জীবনে এত বড় আশীর্বাদ আর নেই, এই দেখেই তোমার মার স্বর্গস্থ আত্মা সুখী হবে।’ বোধহয় যেদিন অফিস যাবার জন্য ট্রেন ধরতে গিয়ে নয়নতারা নৈহাটি স্টেশনে সদানন্দকে অচৈতন্য অবস্থায় প্লাটফরমের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিল এবং তার

বাড়িতে তাকে তুলে নিয়ে এসে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল, সেদিন তার অবচেতন মন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তার বাবার সেই আশীর্বাদকে সার্থক করবার জন্য। সেদিন তার সচেতন মন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, 'কাগজের স্বামী'র পরিবর্তে প্রকৃত স্বামীর সেবা করবার জন্য। সেটাই ছিল তার অন্তরের আহ্বান। বাবার কথামতোই সে স্বামীর সেবা করেছিল, তার সর্বস্ব দিয়ে, নিখিলেশের ঈর্ষাকাতর বিরোধিতার বিপক্ষে। তার সেবা দেখে ডাক্তারবাবুও অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'লোকের স্ত্রী তো দূরের কথা, লোকের নিজ মা-ও এরকম সেবা করে না।' ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা, এর কি স্ত্রী নেই? নয়নতারা বলেছিল, হ্যাঁ, আছে। আবার তারই কয়েকদিন পরে তার সহকর্মিণী মালা যখন তার বাড়ি এসেছিল এবং তাকে প্রশ্ন করেছিল, ওই মানুষটার জন্য তুই এতদিন অফিস কামাই করে রয়েছিস, তা ওর কি নিজের স্ত্রী নেই? তার উত্তরে নয়নতারা বলেছিল, না। এই পরস্পরবিরোধী উক্তিই তো নারী-মনের এক গভীর রহস্যকে অনাবৃত করে। নারী নিজ আচরণের জন্য প্রায়ই লজ্জা-ঘেন্নায় মরে যায়! লজ্জা-ঘেন্নাবশতই মালাকে 'না' বলা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কেননা 'হ্যাঁ' বললে মালা আরও কৌতূহলী হয়ে উঠত, এবং প্রকৃত সত্য জানতে পারলে অফিসমহলে প্রচারিত হ'ত যে নয়নতারা ও নিখিলেশের সম্পর্ক অবৈধ। এখানে সংযত হয়ে গিয়ে বিমল মিত্র এক অসামান্য মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, মেয়েদের স্বভাবসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী তিনি যদি মালার সঙ্গে নয়নতারাকে খোলা-মন নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত করাতেন, তা হলে নয়নতারার পক্ষে সেটা কী লজ্জা-ঘেন্নার ব্যাপার হ'ত! নয়নতারা সেদিন তার অবচেতন মনকে মালার কাছে উন্মুক্ত করেনি। এই 'হ্যাঁ' ও 'না'র মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি নারীর রহস্যময়ী স্বরূপ। সেজন্যই সারভেনটিস্ তাঁর 'ডন্ কুইক্সোট' উপন্যাসে বলেছেন—"**Between a**

woman's 'yes' or 'no', there is no room for a pin to go." নৈহাটিতে থাকাকালীন সদানন্দকে সে স্বামী বলেই গ্রহণ করেছিল, সদানন্দ সম্বন্ধে নিখিলেশ তাকে যাই বলুক-না কেন। কেননা, বিমল মিত্র নয়নতারাকে দিয়ে স্বগতোক্তি করিয়েছেন: 'নয়নতারা বুঝতে পারে ও-মানুষটা যে এ-বাড়িতে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছে, ও-মানুষটার জন্যে যে এতগুলো টাকা খরচ হচ্ছে, নয়নতারার অফিস কামাই হচ্ছে, এটা নিখিলেশের পছন্দ নয়। কিন্তু পুরুষমানুষ এত অবুঝ কেন? এইটুকু বোঝে না কেন যে আজ না হয় ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়, কিন্তু এককালে ওর সঙ্গেই তো অগ্নিসাক্ষী রেখে তার বিয়ে হয়েছিল।' কিন্তু সদানন্দ জানত যে, যাকে সে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, তার কাছ থেকে সেবা নেবার তার অধিকার নেই। এই অধিকারের প্রশ্ন নিয়েই তো নৈহাটির বাড়িতে রোগশয্যায় সদানন্দর সঙ্গে নয়নতারার বিতর্ক হয়েছিল। নয়নতারা তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তো সেদিন সদানন্দকে বলেছিল, 'সাতপাক ঘুরে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, আমার অধিকার নেই, তুমি এ কি কথা বলছ?' যদিও সে তার এ অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিল, তবুও সে জানত যে নিখিলেশের কাছে এটা অপ্রিয় ব্যাপার, সেজন্যই সদানন্দ যখন চলে যেতে চেয়েছিল এবং বলেছিল, 'আমার জ্ঞান থাকলে আমি কিছুতেই এখানে আসতুম না', তখন সে সদানন্দকে বলেছিল, 'তুমি আগে ভালো হও, তারপর চলে যেও, আমি তোমাকে এখানে আটকে রাখবো না, তুমি থাকতে চাইলেও আমি তোমাকে এখানে থাকতে দেবো না—'। আবার সেই নয়নতারাই একদিন সদানন্দকে বলেছিল, 'যেখানে তুমি যাবে, সেখানেই আমি যাবো। তোমার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে পারলে, আমি বেঁচে যাই, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। এ-বাড়ি আমার কাছে এখন বিষ হয়ে গেছে। এ বাড়ির প্রত্যেকটা ইট আমার কাছে এখন অসহ্য

হয়ে উঠেছে, এখানে আর একদিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো, সত্যি। এর থেকে একমাত্র তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারো।' প্রমীলা যে এক রহস্যময়ী জীব, তা নয়নতারার এই পরস্পরবিরোধী উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

দুইখাতে প্রবাহিত নয়নতারার জীবনকাহিনী আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। তার যুগলসত্তাতে আমরা বিস্মিত। সদানন্দই যদি তার অন্তরের দেবতা হয়, সদানন্দকেই যদি সে মনেপ্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করে থেকে থাকে, তবে কি করে তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল দীর্ঘ পনেরো বছর নিখিলেশের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন যাপন করা? বিশেষ করে যখন সে জানত যে নিখিলেশ একজন শঠ, প্রতারক ও প্রবঞ্চক। নবাবগঞ্জে গিয়ে সে নিজের চোখেই দেখে এসেছিল, নিখিলেশ কত বড় মিথ্যাবাদী, কত বড় প্রবঞ্চক। নিখিলেশের এই প্রবঞ্চকতাই তাকে উত্তেজিত করেছিল, নবাবগঞ্জ থেকে ফিরে আসবার পর পৃথক ঘরে পৃথক শয্যায় রাত কাটাতে। নিখিলেশের ওপর তার এ অভিমান কেন? আবার, আর একদিন যখন সে নিখিলেশকে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতে দেখেছিল, তখন সে রাগে জ্বলে উঠে নিখিলেশকে ভৎর্সনা করেছিল। যদি নিখিলেশের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অনুরাগ না থাকবে, তবে কিজন্য তার এই অভিমান, এই রাগ? নিখিলেশের সঙ্গে তো দাম্পত্যজীবন ব্যর্থও হয়নি। সে তো সন্তানের জননী হয়েছিল। মাতৃত্বের গর্বে গরবিনী হয়ে সে তো সমারোহের সঙ্গে উৎসব করতেও মত্ত হয়েছিল। তবে এসব কি তার অভিনয়? বলব, হ্যাঁ, অভিনয়ই বটে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কেন এই অভিনয়? কিসের প্ররোচনায় তার এই অভিনয়? এ অভিনয়ের কারণ, সে তো নিজের মুখেই ব্যক্ত করেছিল সদানন্দর মহানিষ্ক্রমণের রাত্রে নবাবগঞ্জের শয়নকক্ষে। সেদিন সদানন্দকে সে বলেছিল, 'আমার কি এখন থেকে কোন সাধ-আহ্লাদ থাকবে না? আমি কি তা হলে সারাজীবন এমনি করেই তোমাদের বাড়িতে একা-

একা রাত কাটাবো? আমার মনের কথা বলবার, তা হলে কোন লোকই থাকবে না? আমি কি নিয়ে থাকবো? আমি কাকে আশ্রয় করে বাঁচবো? আমার জীবন কেমন করে সার্থক হবে?' কাকে আশ্রয় করে সে বাঁচবে, কে তার জীবন সার্থক করবে, কে তার সাধ-আহ্লাদ মেটাবে, এসব প্রশ্নই তাকে প্রলুব্ধ করেছিল নিখিলেশের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে তার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে।

এককথায় নারী চায় আশ্রয়, নারী চায় একজনকে অবলম্বন করে তার সাধ-আহ্লাদ মেটাতে, তার জীবনকে সার্থক করে তুলতে। সে চায় তার দাম্পত্যজীবনে একজন দীপ্তিমান সহযাত্রী। নয়নতারার কাছে দুই সত্তাই সত্য। কোনটাই মিথ্যা বা **nonentity** নয়। এই দুই সত্তাকে সার্থক করবার জন্য যদি তাকে অভিনয় করতে হয়, তা হলে অভিনয়ের জন্যও সে প্রস্তুত। হয়তো এই অভিনয়ের জন্য যে চাতুর্যের ও অনুষঙ্গের প্রয়োজন হয়, তাকেই বিমল মিত্র 'ম্যাকস্ ফ্যাকটর' বলেছেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে নারী অসাধারণ পটুতার অধিকারিণী। তার এ অভিনয় চলচ্চিত্রের অভিনয়ের মতো। চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাদের দাম্পত্যজীবনের অভিনয় করতে দেখে দর্শকের কি একবারও মনে হয় যে বাস্তবজীবনে এদের আর একটা সত্যিকারের দাম্পত্যজীবন আছে?

নারীর দুটো সত্তা আছে। একটা আটপৌরে বা বাহ্যিক সত্তা, যেটা সে লোকসমাজে প্রকট করে। অপরটা তার অন্তরের সত্তা, যে সত্তা তার অবচেতন মনে সুপ্ত হয়ে থাকে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ অনাবৃত করে। এই যুগলসত্তার বিদ্যমানতাই আমরা নয়নতারার মধ্যে দেখি। নয়নতারার বিসদৃশ আচরণ দেখে ডাক্তাররা হয়তো বলবেন, নয়নতারা 'সিজোফ্রেনিয়া' (**Schizophrenia**) ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু আমি বলব, প্রমীলার ক্ষেত্রে সিজোফ্রেনিয়া মোটেই কোন ব্যাধি নয়। এটা প্রমীলার সহজাত বৈশিষ্ট্য। এই বিশিষ্টতার জন্যই বিধাতা প্রমীলাকে রহস্যময়ী করে তুলেছেন। মনে হয় এ-সম্বন্ধে সত্যিকথাটা বলেছেন

জার্মান দার্শনিক নিট্‌সে। তিনি বলেছেন, 'নারী-সৃষ্টি বিধাতার দ্বিতীয় ভুল' (**'Woman was God's second mistake'**)।

প্রমীলার এই সহজাত বৈশিষ্ট্য, নারীদেহে কোন বিশেষ 'হরমোন'-এর বিদ্যমানতার জন্য ঘটে না। এটা ঘটে অবস্থাবিপাকে, যে ঘটনা বা মনের বিশেষ অবস্থার (**situation**) সে সম্মুখীন হয়, তারই ঘাত-প্রতিঘাতে। আদিমকাল থেকেই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশই তার চরিত্রগঠনে তাকে সহায়তা করেছে। সে যে রহস্যময়ী, এটা তার শাশ্বত ধর্ম। সেজন্যই সিমোন দ্য বভোয়ার বলেছেন—**'She revels in immanence, she is contrary, she is prudent and petty, she has no sense of fact or accuracy, she lacks morality, she is contemptibly utilitarian, she is false, theatrical, self-seeking and so on.'** এটা এমন এক অস্তিবাদী নারীর উক্তি, যে সারাজীবন অনুশীলন করে গেছে নারী-চরিত্র নিয়ে। এই উক্তির মধ্যেই আমরা নয়নতারার সত্তাকে খুঁজে পাই, তার বিচিত্র আচরণের ব্যাখ্যা পাই। মনে পড়ে কনফুসিয়াস-এর কথা। তিনি বলেছিলেন—চাঁদের ওপিঠে কি আছে তা পুরুষমানুষের পক্ষে জানা সম্ভবপর; কিন্তু মেয়েদের মাথায় কী ভাবনা-চিন্তা বিরাজ করছে, তা জানা সম্ভবপর নয়। সেজন্যই আমাদের দেশের ঋষিরা বলেছেন - নারীর মনের মধ্যে যে কী আছে তা 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'। তাদের মাথায় কী পোকা কিলবিল করছে, তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তা হলে তো নারীকে আমরা রহস্যময়ী বলে মনে করতাম না। তা হলে তো নয়নতারাও আমাদের কাছে রহস্যময়ী হয়ে উঠত না।

স্বীকৃতি : এই বইয়ের প্রথম তিনটি প্রবন্ধ 'স্বকন্ঠা'তে ও চতুর্থ প্রবন্ধ 'মহানগর'-এ বেরিয়েছিল।
শেষ প্রবন্ধটি সংযোজন।